পরীক্ষিৎ সান্যাল

না না র ক ম

আটা মাজি সটক লি

সহজ কথা যায় না বলা

বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ

অরুণাচল

সাহারায় শিহরণ

আমি আছি তাই

আ শী র্বা দ

(অথবা **আটা মাজি সটক লি)**

রতনের মনে আছে, ছোটবেলায় যে বাজারের নাইলনের ব্যাগ ভর্তি করে গম নিয়ে যেত গমকলে ভাঙ্গাতে। বনবন করে ঘুরন্ত যন্ত্রটাকে দেখে মনে হত রাগী একটা দৈত্য। রতন কাছে যেতেই ভয় পেত। কেমন করে দানা দানা গম ওর ভিতর থেকে গুঁড়ো গুঁড়ো আটা হয়ে বেরিয়ে আসে রতন ভেবেই পেতনা। গমকলের মালিক কালো মুশকো সুবর্ণকাকু এককোণে বসে আটার গুঁড়োয় মাখামাখি হয়ে খাতা লিখতেন। গোটা জায়গাটাই ছিল রতনের কাছে বিভীষিকা।

সেই সুবর্ণকাকু এখন রতনের তিন চার ঘর পরেই দোকান দিয়েছেন। পান বিড়ি সিগারেটের দোকান। দক্ষিণ শহরতলির এই অঞ্চলে কালি কলমের কারখানা বন্ধ হওয়ার পর অনেকেরই এই অবস্থা। রতন বিশ্বাস ছিল পেন্টার, নানা রঙের কলম কারখানার জঠর থেকে বের করে আনত। উপরি হিসেবে সুমিও বাৎসরিক দু-চারটে কলম উপঢৌকন পেত।

এখন অবশ্য সুমির আর কলমের দরকার হয়না। যেখানে একসময় কারখানার ধোঁয়ায় চারদিক কালো হয়ে থাকত, সেখানে এখন অভ্রভেদী হর্ম্য। 'মল'। আশপাশে হুহু করে জমির দাম বেড়েছে। প্রচুর নতুন ফ্ল্যাটবাড়ি, নতুন পুরনো মিলেমিশে গাড়ি। মেন রাস্তাটায় ট্রাফিক লাইট বসেছে, বড্ড জ্যাম। 'মল' এর ঠিক সামনে ঝুপড়ি দোকান গজিয়েছে প্রচুর। প্রায় সকলেই পূর্বতন ফ্যাক্টরির লেবার। একটা অটো ইউনিয়ন হয়েছে। ট্যাক্সি ইউনিয়ন হব হব করছে। মোড়ের মাথায় এমন সব দোকান উঠেছে, যা এতদাঞ্চলের লোক কস্মিনকালেও দেখেনি। গুচ্ছের রোল-চাউমিন-মোগলাই স্টল, একখানা মোমো প্লাজা, তিনটে ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট। রতনের সবচেয়ে অবাক লাগে ওই দোকানটা দেখে, যার

মাথার ওপর সাইনবোর্ড, তাতে গ্লাস হাতে হাস্যমুখ ধোনী প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছেন - "জীবনে বড় কি করলে?" সত্যিই তো, বড় কিছু কেন, ছোটখাট কাজও যে রতন বিশ্বাস করে উঠতে পেরেছে তা নয়। হয়তো ওই রঙচঙ্গে বোতলগুলোই বড় কিছু করার পাথেয়। রতন বেশি ভাবতে পারেনা। চিন্তা করতে গেলেই মাথাটা কেমন গুলিয়ে যায়। আসলে ঘরে বসে থেকে থেকে শরীরের সাথে সাথে রতনের মগজটাতেও জং ধরে গেছে।

সে দিনগুলোর কথা মনে পড়লে রতনের একটা প্রবল শারীরিক কষ্ট উদ্ভুত হয়, হাতেপায়ে যেন খিঁচ ধরে আসে। সকাল আটটার মধ্যে সুরেখা ভাত বেড়ে দিত, সুমিকে স্কুলে ছেড়ে দিয়ে রতন ঢুকে যেত কারখানায়। সারাদিন খাটাখাটনির পর সন্ধেবেলা বাইরের ঘরটায় বেতের মাদুরে পা মুড়িয়ে বসার আরামটা মনে পড়তেই রতনের চোখ বুজে এল।

একখানা জোরালো হাঁক শুনে রতনের তন্দ্রা ছুটে গেল। সুবর্ণকাকুর আওয়াজ। অর্থাৎ রতনের কাজ শুরু হল। সুরেখা একচিলতে কলতলায় কাপড় কাচছিল। ভেজা ম্যাক্সির ওপর একটা ওড়না চাপিয়ে বেরিয়ে এল। সুবর্ণকাকুর হাতে দুটো বড় বড় 'আশীর্বাদ' আটার ব্যাগ। সব মিলিয়ে কুড়ি কিলো। রতন মনে মনে হিসেব করে নিল। অন্ততঃ এক হপ্তা চলবে। আজ তিন কিলো মত মেখে রাখলেই হবে।

"নে রতন, লেগে পড় বাবা। পয়ত্রিশ টাকা কেজি। সারাজীবন আটা মাখামাখি করলুম, এমন দেখিনি বাপু। কোন কল থেকে যে বার করে আনে - আটা নয় যেন সোনার গুঁড়ো!"

সুরেখা খাটের নিচ থেকে একটা বাক্স বের করে ভিতর থেকে তিনটে নোট সুবর্ণকাকুর হাতে দিয়ে বলল - "সত্যিই কাকু, আপনি আছেন বলে তাও একটু সস্তায় পাই। একটু বসে যান, চা বসানোই আছে।"

কথাটা যে মিথ্যে সুবর্ণকাকুর অজানা নয়। "নানা বৌমা, আমার বসার কি ফুরসৎ

আছে ! দোকানের থেকে একটু নজর সরালেই -" একগাল হেসে তিনি দরজার দিকে পা বাড়ালেন। রতন নিশ্চিন্ত হল। সপ্তাহে একদিন সকাল সকাল এই ছোট্ট নাটকের অবতারণা হয়। সবারই চোখ সয়ে গেছে।

সুবর্ণকাকু বেরিয়ে যেতেই সুরেখা আটার ব্যাগদুটো এককোণে রাখা চটের ওপর ফেলে কোন কথা না বলেই চলে গেল। রতনের সারা শরীর যেন চিড়বিড়িয়ে উঠল। এই নিরাসক্তি, এই অগ্রাহ্যের ভঙ্গিটাই রতনের সবচেয়ে অসহ্য লাগে। প্রথম প্রথম যখন কারখানা বন্ধ হল, তখন মেয়ে বৌয়ের চোখে যে সহানুভূতি দেখেছিল রতন, 'মল' উঠতেই সেটা বদলে হল অনুকম্পা। তারপর আজ দেড় বছর পর শুধু একটা শীতল বিতৃষ্ণা।

অথচ চেষ্টার বাকি রাখেনি রতন। সামান্য সঞ্চয় দিয়ে টিনশেডের দোকান তুলেছিল, কিন্তু মেনরাস্তার ওপরে না হওয়ায় সে দোকান মাঠে মারা গেছে। অটোর লাইনে নাম লিখিয়েছিল, কিন্তু ইউনিয়নের খাঁই মেটানো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই 'মল' তৈরির কাজেই কিছুদিন মজুর খেটেছিল, কিন্তু সে আর কতদিন। বিশেষতঃ যখন একসাথে হাজারখানেক লোক বেকার, তখন চট করে একটা জীবিকা খুঁজে নেবে কতজন ?

আপাততঃ বাড়ি বাড়ি খবরের কাগজ দেওয়ার একটা কাজ জুটেছে রতনের। সকাল সাতটার মধ্যে কাজ শেষ, তারপর বাকি দিনটা যেন রতনের আর কাটতে চায়না। একই আড্ডা আর কাঁহাতক চলতে পারে। তবুও রতন বেরিয়ে পড়ে, কখনো সুবর্ণকাকুর দোকানে, কখনো রেললাইনের পাড়ের ঝুপড়িতে। বাড়ি থাকলেই তো সবার ঠান্ডা নিস্পৃহতা সহ্য করতে হবে।

মাঝে মাঝে রতনের মনে হয়,মা মেয়ে মিলে বোধহয় সাঁট করছে। কারখানা বন্ধ হওয়ার পরে দুচারটে সংসার ভেঙ্গেছে। মরুকগে। রতন যে একটা মরা ফিউজ সেটা এতদিনে সবাই জেনে গেছে। বৌ থাকা না থাকা সমান। দুজনে এখনো এক

বিছানায় শোয়, অন্য ঘর নেই বলে। সুরেখার দিকে ফিরে শুতেও রতনের ভয় করে। না, বাধা দেবেনা সুরেখা। কিন্তু বাকি সময় যা হোক, ওই কটা মুহূর্তের জন্য সুরেখার ঠান্ডা চাউনি রতনের কিছুতেই সহ্য হবেনা।

আটার ব্যাগগুলোর দিক চেয়েই রতনের মনটা বিষিয়ে গেল। কি সুন্দর লালরঙ্গের ব্যাগ। ট্রলিতে করে 'মল' থেকে লোকে কিনে নিয়ে যায়। জানলা দিয়ে উঁকি দিলেই 'মল' এর বড় পোস্টারটা চোখে পড়ে। ছেলে বৌ নাতি নাতনি দাদু ঠাম্মা সবাই মিলে কেমন সুন্দর ট্রলি ঠেলছে। আর কি নেই সে ট্রলিতে - ম্যাগি সস কোকাকোলা ফ্রোজেন চিকেন ভ্যানিলা - মায় এই আটার ব্যাগটা পর্যন্ত। রতন ভেবে পায়না, আটার ব্যাগটা দিয়ে ওরা করে কি ? এপাড়ার প্রায় সব বাড়ি থেকেই সুরেখার রুটি কিনে নিয়ে যায়। সুরেখা ছাড়াও রুটির দোকান এ তল্লাটে আরো তিনটে, মোটামুটি ভালই চলছে।

গত একবছর ধরে আটা মাখতে মাখতে রতনের হাত সড়গড় হয়ে এসেছে। প্রথম প্রথম ভুল হত খুব। কোনদিন নুন কম, কোনদিন জল বেশি। আর সুরেখার ভ্রুকূটি। নিক্তি করে মাপা আটা, গোণাগুণতির রুটি। জল বেশি পড়ে ম্যানেজ দিতে গিয়ে অতিরিক্ত আটা খরচ হলেই হিসেবে গোলমাল। আর আজকের মাখা আটায় কাল রুটি বানানোর প্রশ্নই নেই। এ পাড়ায় খানেওয়ালা খুব, জিভ ঠেকিয়েই ধরে ফেলবে কালকের আটা মাখা।

রতন অভ্যাসমত গামলা নিয়ে বসল। তিন কিলো আটা মাখা বেশ পরিশ্রমের কাজ, বিশেষতঃ যখন শেষের দিকে ব্যাপারটা একটা বড় তাল হয়ে আসে। তারপর ছোট ছোট দলা আলাদা করা, সুরেখার দেওয়া মাপ মত। নইলেই রুটি কম পড়ে যাবে। কম্পিটিশন খুব। মোড় পেরলেই শশাঙ্কর দোকান। রুটির সাথে ঝাল ঝাল ডিম তরকা বানায়। যত স্টুডেন্ট আর ব্যাচেলরদের ভিড় ওর কাছে। সুরেখার হাতের গুণেই এখনো অব্দি ফ্যামিলি মেম্বাররা ওর কাছেই আসে। তাই আটা মাখার

ব্যাপারে সুরেখা বেশ খুঁতখুঁতে।
মন দিয়ে আটা মাখতে বসল রতন। এসময় একটু সতর্ক থাকে রতন, ঘরে যেন হঠাৎ বাইরের কে ঢুকে না পড়ে। কি যেন একটা গর্হিত কাজ করছে এমনভাবে তাড়াতাড়ি ব্যাপারটাকে সেরে ফেলতে চায়। অবশ্য কার কাছে কিই বা লজ্জা ! সবাই বেকার, এধার ওধার থেকে উঞ্ছবৃত্তি করেই চালাচ্ছে। ওর মধ্যে যারা অটো পেয়ে গেছে তাদের র‍্যালা একটু বেশি। বলতে গেলে একরকমের বাঁধা রোজগার। রতনের মত দুচারজনই আছে, যারা কোন লাইনই ধরতে পারেনি। নাঃ, অন্যমনস্ক হলেই গোলমাল, রতন কাজে মন দিল। সুরেখার কাপড় কাচাকাচি শেষ হলেই তাড়া লাগাবে। দুপুরের খদ্দের আছে কিছু, কিন্ত আসল বিক্রি শুরু হয় সন্ধে সাতটার পর থেকে। মাসে তিনটে সিলিন্ডার খরচ হয়েই যায়। তিনটাকা পিস করেও যে সামান্য লাভ থাকে তাতে কোনওক্রমে চলে যায়। তাও ঘাড়ের কাছে শশাঙ্কর আড়াই টাকার রুটি নিঃশ্বাস ফেলছে। রতন মাখা শেষ করে হাত ঝাড়তে লাগল। আজকের মত কাজ শেষ।

দুপুর দুটো থেকে পাঁচটা সুরেখা একটু বিশ্রাম পায়। এসময় রতন বেরিতে যায়, সুরেখা আর সুমি ধীরেসুস্থে দুপুরের খাওয়া শেষ করে। প্রায় রোজই গতকাল রাতের ভাত আর কোন একটা সবজি বরাদ্দ থাকে। ভালমন্দ বলতে কোনদিন হয়তো মুগের ডাল বা একটা ডিম আধখানা করে খাওয়া। দুজনেরই অভ্যাস হয়ে গেছে। রতন ঘরে খায়না, রোজই বিকেল বিকেল ফিরে এসে বলে বাইরে কোথাও খেয়ে এসেছে। সুরেখা জানে, রোজ দুপুরের খাওয়া খাওয়াবে এমন বন্ধুভাগ্য রতনের নয়। একটা পেট কমাতেই লোকটা বেরিয়ে যায়। আগে সুরেখা একটু ভাত আলাদা করে দিত, এখন আর রাখেনা।
সুরেখা এই রতনকে চিনতে পারেনা। শরীর তো ভেঙ্গেছেই, তার সাথে সাথে

রতনের মধ্যে কেমন একটা নেতিয়ে পড়া ভাব এসেছে। সবসময় যেন সন্ত্রস্ত ! সুরেখার নিজের শরীরটাই কি আর রয়েছে ? তবু এপাড়ায় নজর দেওয়ার লোকের অভাব নেই। দোকান খুলে বসলে অত বাছবিচার চলেনা, এই ভেবে নিজেকেই প্রবোধ দেয় সুরেখা। যার স্বামী এমন একটা ··· যাকগে ।

আর একবছর দোকানদারী করে সুরেখার মধ্যে বেশ একটা ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী ভাবও এসেছে। বেশ কিছু লোক স্রেফ খেজুরে গপ্প করতে দোকানের সামনে বসে থাকে। সুরেখা ভাবে, যদি হরেনের চায়ের দোকানের সামনে এই আড্ডাটা রেগুলার বসে, সেটা হরেনের ব্যবসাবৃদ্ধির লক্ষণ। সুরেখা মেয়ে বলেই ব্যাপারটাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন? আড্ডা বসুক, তর্ক হোক, জমজমাট হোক দোকান। হরেন যেমন চুপচাপ ডিমটোস্ট সাপ্লাই দিতে থাকে, সুরেখাও তেমনি নির্লিপ্তমুখে রুটি সেঁকতে থাকে।

রাত নটার সময় দোকানের সামনে রীতিমত ভিড় জমে যায়। সুরেখার যদিও আগে থেকে রুটি বেলাই থাকে, তবুও এক একদিন একাহাতে সামলাতে পারেনা। সুমিকে ডাকতেই হয়। সেঁকার কাজটা করে দেয়, আর ফোলানোটা সুরেখার নিজের ব্যাপার। গনগনে আগুনে প্রতিটা রুটি যতক্ষণ না ফুলে পুরো গোল হয়, ততক্ষণ ছাড়েনা সুরেখা, খদ্দেরের যত তাড়াই থাকুক। রাত এগারোটার সময় ঘর্মাক্ত সুরেখা শেষ চারটে রুটি খুব যত্ন নিয়ে বানায়। মেয়ে খায়, নিজেও খায়। রতন সুরেখার রুটি খায়না, ভাত বসাতেই হয়, শুতে শুতে বারোটা।

এক একদিন সুরেখার শরীর আর দিতে চায়না। টানা ছ সাত ঘন্টার আগুনের আঁচ, দেড় দুশো রুটি বেলার পরিশ্রম, সুরেখার কোমর পিঠ টনটনিয়ে ওঠে রোজই। কিন্তু খদ্দের ফেরাতেও ভয় করে ভীষণ। একবছর সুমির স্কুল বন্ধ। এবছর সুমিকে স্কুলে পাঠাবে বলে নিজের কাছেই বেশ কয়েকবার প্রতিজ্ঞা করেছে সুরেখা। 'মল' এর সামনে বেশ কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে এর কাছে ওর কাছে কোল্ড ড্রিঙ্কের

তলানি কি পিৎজার ভুক্তাবশেষ চেয়ে বেড়ায়, ডাস্টবিন হাটকায়। ওদের দেখলেই সুরেখার কি একটা অজানা আশঙ্কা হয়, চোখ বুজে ফেলে।

গরিবেরও নানারকম আছে। স্রেখার হাসি পেল। তার একচালা টিনের ঘরের সামনেও মাঝেমাঝে বৈরাগী কি কুষ্ঠ নিবারণী সমিতি এসে হাজির হয়। সুরেখা নিজের বাড়িতে কোনদিনও এদের ফেরায়নি, কিন্ত এখন এমন হাঘরে অবস্থা যে দরজার সামনে এসে দাঁড়াতে লজ্জা করে। ফ্ল্যাটবাড়িতে দারোয়ান আটকে দেয়, তাই বেচারারা যেখানে খালি দরজা দেখে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে। দুর্ভিক্ষ।

অথচ ভারত উদয় চলছে। এইতো গত পরশুই অটোস্ট্যান্ডে গরম গরম বক্তৃতা হয়ে গেল। বেশ পলিশড, দ্যুতিময় নেতা। দেশে টাকা বাড়ছে, সম্পদ বাড়ছে, ব্যবসা বাড়ছে, মাইনে বাড়ছে, ডি.এ বাড়ছে, ইন্টারেস্ট রেট বাড়ছে। সবাই 'মল'-এ খরিদ্দারি করবে, কাজের লোকের মাইনে বাড়বে, পুজোর বকশিস বাড়বে, গিন্নিরা রুটির ব্যাপারটা আউটসোর্স করে দেবেন। এইভাবে উন্নতির ফল্গুধারা নাকি চুঁইয়ে চুঁইয়ে top down বইতে বইতে একদিন সুরেখার হেঁশেলও ভাসিয়ে দেবে। সুরেখার চোখে স্বপ্ন সাঁতরাতে থাকে। হয়তো একদিন সত্যিই সুরেখার দোকানে রাস্তার ওপারের 'ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট' – এর মত বড় সাইনবোর্ড লাগবে, দুটো মাইনে দেওয়া কাজের লোক থাকবে। আচ্ছা তারা কি সুরেখার মত রুটি ফোলাতে পারবে। মরুকগে ! সুমিকে তো আর রুটি বেলতে হবেনা। সুরেখা ভাবতে থাকে, একদিন হয়তো মেয়েকে নিয়েই 'মল'-এ ঢুকবে। নানা, অতদূর ভাবা ঠিক নয়, সুরেখা চোখ বুজে ফেলে, দোকানটা যেন বাঁচে।

আজ বোধহয় একটু বেশিই ঘুমিয়ে পড়েছিল সুরেখা। বিছানা থেকে উঠে দেখল, সন্ধে ছটা। রতন ফেরেনি , এখন থেকে রুটি বেলে না রাখলে ম্যানেজ করা যাবেনা। সুরেখা কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে ভিতরের ঘরে এল। সুমি রুটি বেলতে বসে গেছে ঠিক।

অনেকগুলো ছোট ছোট আটার দলা। রতন সাজিয়ে রেখে গেছে। সুরেখার মনে পড়ল, মার সাথে সেও আটা মেখেছে। ছোটবেলায়। সুমির কি ছোটবেলা আছে?
'সুমি'।
সুমি পিছন ফিরে মায়ের দিকে তাকাল। সুরেখা মেঝেতে হাঁটুমুড়ে বসে মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে বলল - "নে আজ আর বেলতে হবেনা"।
সুমি চুপচাপ।
সুরেখা আটার একটা দলা তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে একটা পাখি, অথবা খেচরবিশেষ কিছু বানিয়ে সুমির হাতে ধরিয়ে দিল।
সুমি জুলজুল চোখ করে দেখছে। আটার দলার যে রুটি ছাড়াও অন্য পরিণতি আছে, এ তার ধারণাতীত। যখন সত্যিই পাখিটা ফুটে উঠল, তখন তার আর বিস্ময়ের সীমা রইলনা। মোটামুটি গড়নটা তৈরি হওয়ার পর সুরেখা একটা ঝাঁটার কাঠি দিয়ে পাখির দুটো চোখ বানিয়ে দিল।
সুমির সাত বছরের জীবনে এ অভিজ্ঞতা এতটাই নতুন, যে পাখিটা নিয়ে কি করবে বুঝতেই পারলনা।
'যা ওঘরে যা' - সুরেখা তাওয়া গরম করতে দিল।
রাত সাড়ে নটার সময় যখন রতন ঘরে ঢুকল তখন দোকানের সামনে রীতিমত হাঙ্গামা। একাহাতে সামাল দিতে সুরেখা নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে। দুচারজন খদ্দের সরেও পড়ছে।
ঘরে ঢুকেই রতন দেখল সুমি ভিতরের ঘরে একটা আটার পাখিকে খুব মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে।
দৃশ্যটা দেখেই রতনের মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। সে মেয়েকে একটা চড় মেরে বসল।
সুমির আজ বিস্ময়ের শেষ নেই। বাবা যে মারতে পারে, এ অভিজ্ঞতাও তার নতুন

। গলা ছেড়ে কাঁদার অভ্যাস নেই, নীরব অশ্রু ছাড়া সুমি কোন প্রতিবাদই করতে পারলনা।

সুরেখা ততক্ষণে ভিতরের ঘরে ছুটে এসেছে। এ দৃশ্যের অবতারণা এ বাড়িতে প্রথম। সেও খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হয়তো কিছু একটা বলতেই হয়, তাই গজগজ করতে করতে রতন বলল - "সারাদুপুর খেটে আটা মাখলাম, উনি কোন জমিদারের বেটি তা নিয়ে খেলতে বসেছেন! আটার কেজি কত করে জানিস?"

রতনের গলায় ফোঁস যতটা, জোর তত ছিলনা। সুরেখা কিছু না বলেই মেয়েকে নিয়ে বাইরের ঘরে চলে গেল।

আবার সেই উপেক্ষা।

যেন কিছুই হয়নি।

রতনের কোন কাজেরই কোন ফলশ্রুতি নেই।

রতন থম মেরে বিছানায় বসে পড়ল। বিশ্বসংসারের প্রতি একটা অব্যক্ত ঘৃণা যেন জমাট বেঁধে তার সমস্ত শিরা উপশিরা বুজিয়ে দিচ্ছিল।

সে কেউ নয়, কিছু নয়।

রতনের হঠাৎ মনে পড়ল, একসময় সেও কিছু একটা ছিল।

সে ছিল কারখানার পেন্টার।

পরদিন সকালে রতনকে খুঁজে পাওয়া গেলনা।

পাওয়া গেল একটা রংচঙ্গে আটার পাখি, সুমির বালিশের ঠিক পাশে। ধাতব রঙের প্রলেপে সেটা বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে।

'ডব্লিউ জাংশন', অরুণাচল, ২০১৪

সহজ কথা যায় না বলা

আমি এককালে সাধুভাষায় লিখতাম। আমার মনোজগতের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর প্রেত ঘোরাফেরা করত, অতএব 'খর-করবালে', 'রঞ্জিতদশন', 'গুড়াকেশ', 'ব্যূঢ়োরস্ক' এরকম নানা শব্দ আমার লেখার মধ্যে ঘোরাফেরা করত। কখনো কখনো সংসদ বাংলা অভিধান খুলে লিখতে বসেছি, স্বীকার করছি। যাকে বলে সহজ ভাষা, অর্থাৎ যাতে সুনীল গাঙ্গুলি লিখে থাকেন, তা আমার পোষাতনা, সত্যি বলতে একটা নাক সিঁটকানো দূরত্বই মেনটেন করতাম। তারপর আমার খানিক বয়স হল, গোঁফে চিরুনি চালানো শুরু করলাম, কমলকুমার – সন্দীপন – নবারুণ ভট্টাচার্য্যের গদ্য পড়ে মাথা ঘুরে গেল। সন্ধ্যাভাষার মোহটা একেবারেই কেটে গেল। সহজ কথা সোজাভাবে লিখব বলে ঠিক করলাম।

কিন্তু সহজ কথা দুনিয়ায় আছে কটা ? লিখব বলে মাঠে নেমে পড়লেই যে এন্তার গোল দিয়ে যাব, এত অনায়াসলভ্যা নন সাহিত্যলক্ষ্মী। তিনি চিরমার্গিতব্যা, কখনো কনককিরীটী কোহিনুর, কখনো স্ফটিকাশ্রুজাতিকা নিটোল মুক্তা। কত কথাই তো ভাবি, কত দেখি, 'পরে লিখতে কাজে লাগবে' এই ভেবে অভিজ্ঞতার ঝুলিতে ঠুসে ঠুসে মাল তো ভরলাম প্রচুর, কিন্তু লিখতে গেলেই 'সহজ হব' এই উর্ণনাভপাশে আটকা পড়ি (উর্ণনাভ ঠিক বানান লিখলাম তো ? ইস, হাতের কাছে ডিকশনারিটা নেই)।

এই সহজিয়া ভাবনা বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আমদানী। তার আগে কবিতা বলতে ভারতচন্দ্রের ব্যাঁকাতেরা ব্যাজস্তুতি ('কোন গুণ নেই তার কপালে আগুন'), মধুসূদনের যথেচ্ছ নামধাতু ('নিকুম্ভিলা'-র সাথে মিল দিতে 'বধিলা') আর হাইফেনের জায়গায় 'এন্টার' কি দাবানো। লাইনের ছনম্বর অক্ষর থেকে শুরু হল নতুন সেনটেন্স, এবার দেখ কেমন লাগে! তিন লাইন বিশেষণের পর হয়তো

সেমিকোলনে শেষ হল, অথবা হলইনা - একটা লম্বা ড্যাশ মেরে দিয়েই ফের – 'হায় মন্দোদরী' ! অন্যদের কথা বলতে পারিনা, আমি 'মেঘনাদবধ' পড়েছি রীতিমত খাতা কলম নিয়ে বসে। মধুসূদন স্কলার লোক, খুব বেশি লোক তার লেখা পড়বে এ তার হয়তো তার অভিপ্রেত ছিলনা। কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের এঁচোড়েপাকা স্বভাবকবি হয়েই তিনি জীবন কাটিয়ে দিলেন। কিছু অন্ধ ভক্ত (তাদের মধ্যে দুচারজন মহিলা হলে ভাল হয়, এমনিই বাতাস লাগাতে আরকি), আর খানিকটা অ্যালকোহলের মধ্যে তিনি সার্থকতা খুঁজে পেতেন। আমরা বাঙ্গালিরা 'নৈতিক জয়', 'gallant loser' এসবের মধ্যে বেশ একটা মাখো মাখো সোহাগ খুঁজে পাই। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের কর্ণ (আশাকরি কেউ রবীন্দ্রনাথকে 'অর্জুন' বলে বসবেননা), এবং স্বীকার করতে বাধা নেই, সেকারণে তাঁর প্রতি আমার একটা বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে। 'বড়মাপের কবি' ব্যাপারটা কি আমি ঠিক বুঝিনা, তবে মধুসূদনকে কেউ ও নামে ডাকলে আমি আপত্তি তুলিনা। বিশেষতঃ আমি যতবার বাংলায় কবিতা লিখতে গিয়েছি, ততবার 'রচিলা কি শরজালে উপাধান যথা' এজাতীয় লাইন বেরিয়ে এসেছে। সাধে আমার প্রেম করা হলনা ! মধুকবি বাঁশিলা আমারে।

রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি well adjusted কলকাতার ছেলে, ছোটবেলা থেকেই পাড়ার মাচায় আবৃত্তি - সঙ্গীত পরিবেশন – নাটক করে অভ্যাস। একটা টিম স্পিরিট বাল্যকালেই তৈরি হয়ে গেছিল, যেটা সারাজীবন তার পিছু ছাড়েনি। কারণ 'বাল্মীকিপ্রতিভা' লিখতে গিয়ে যতই 'ক্রৌঞ্চ', 'ক্রৌঞ্চ' বলে বাহাদুরি ফলান, স্টেজে নামাতে গেলেই ভাগ্না ভাগ্নীর দল ছেঁকে ধরবে 'মামা মামা ক্রৌঞ্চ কি' ? তারপর যতক্ষণ না তাদের বক দেখাচ্ছেন, অর্থাৎ থার্মোকলের বক বানিয়ে স্টেজে নামাচ্ছেন, ততক্ষণ নাটক নামবেনা। আমার মনে হয় শিশুসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক বিরাট আশীর্বাদ, যা মধুসূদন কিংবা নজরুল কারো কপালেই খুব একটা জোটেনি। রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনাতেও থার্ড মোলারের মত দুটো একটা

অপরিস্ফূট দুরুচ্চার্য্য শব্দ চোখে পড়ে, কিন্তু ঠাকুরবাড়ির অজস্র নাতি নাতনী ভাইপো ভাইজি ভাগ্নে ভাগ্নীর মধ্যে ডিস্টিলড হয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন বেরলেন, তখন আর শব্দগ্রন্থিকার মায়া তার নেই। কারণ গল্প কবিতা নাটক যাই বলুন, এই কঁচিকঁচারাই তখন তার কুশীলব। তার টার্গেট অডিয়েন্স। বাংলা ভাষার সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথ কলেজে যাননি। তাহলে হয়তো সতের বছর থেকেই – 'চুল তার কবেকার বিদিশার নিশা' চালু করে দিতেন। আর 'আধুনিক' কবিতার নেশা বড় সর্বনাশা। একটা বাক্যবন্ধ, যার সরাসরি কোন মানে নেই, কিন্তু শব্দগুলো পাশাপাশি দেখলে বড় ভাললাগে ('মনে পড়ে অশ্লীল সময়ের মত/ ক্যালেন্ডারে লাল দাগ কাটা/ ছুটি নয়, শোণিতে রাঙ্গানো নভেম্বর'), এবং চট করে 'আলাদা' হওয়ার একটা খ্যাতি পাওয়া যায়, এর নেশায় বাঙ্গলাদেশে কাগজ নষ্ট হয়েছে ঢের (আমি পরিবেশবান্ধব, ল্যাপটপে লিখি। মাথামুন্ডু যাই লিখি, দূষণের দায় নেবনা)। রবীন্দ্রনাথের 'সহজ' ভাবনাটা এতটাই দৃঢ়প্রোথিত, যে তার সাধুভাষার গদ্যেও তৎসম শব্দ ভেবেচিন্তে বসাতেন। আর গানে তো কথাই নেই , 'গীতবিতান' আর 'সহজ পাঠ' দুয়েতেই যুক্তাক্ষর অপ্রতুল, স্বরবর্ণ বিশেষতঃ 'আ' এর প্রাদুর্ভাব। রূপমেরও যেন গাইতে গিয়ে কোথাও না আটকায়, তাইজন্য সুর লয় তাল কোথাও কোনও বাহাদুরি নেই। 'চেনাশোনার কোন বাইরে' - র আগে 'উ লা ল্লা' বেশ ফিট করানো যায়। একটা নজরুলগীতিকে এরকম জলের মত এপাত্র থেকে ও পাত্রে ঢেলে দেখান দেখি কোন 'সঙ্গীত পরিচালক' ('পরিচালক' কেমন ড্রাইভারের মত শোনায়, তাইনা ! যেন সাত সুরের সাত ঘোড়াকে হ্যাট হ্যাট করতে করতে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোচোয়ান)। একটা টিপিকাল রবীন্দ্রসঙ্গীত

আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেএলাআতে
তোমার সুরে সুরেএএ সুর মেএলাআতে
একতারাটিইইইইইইইর একটিই তাআরে

গানের বেএদওওওন বইতেএ নাআরে

কেমন সুন্দর কলাম করা, টাইপরাইটারের পাতার মত, সুমনের ভাষায় 'ছিপছিপে কবিতা'। আর নজরুল ?

আজোও কাঁআআদেএ কাআনওনে

কোওয়েলিইয়াআআআ

চঅমপা কুউনজে আআআজোও গুউঞ্জে

ভ্রঅমঅরা, কুউহরিছে

পাআআপিয়াআআআআআআআআআআআ

ব্যাতিক্রম আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মূল ভাবধারাটাই যে সহজ, সবার জন্য (অনিল বিশ্বাসী ভাষায় 'গণতান্ত্রিক') একথা নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করবেননা। তার কারণ প্রথমে ঠাকুরবাড়ির বাচ্চাকাচ্চাদের জন্য ছড়া কবিতা নাটক, তারপরে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মসঙ্গীত, তারপর শান্তিনিকেতনের স্কুল চালাতে নৃত্যনাট্য, তারপর বাংলাদেশের সমস্ত বেণীবাঁধা খুকিদের পাকা দেখার জন্যে একগাদা রবীন্দ্রসঙ্গীত, এসমস্ত লিখতে লিখতে নিজের জন্যে লেখার ফুরসৎ খুব কমই পেয়েছেন গুরুদেব। প্রমাণ? বিভিন্ন মঞ্চে সাতবার 'চন্ডালিকা', চারবার 'চিত্রাঙ্গদা', তিনবার 'তাসের দেশ', দুবার 'রক্তকরবী' দেখলাম। 'অরূপরতন' একবারও না। ওটা নাকি 'ফিলজফিকাল' 'মেটাফরিকাল' 'অ্যালেগরিকাল' এবং আরো কি কি কাল। আসল কথা ওটা গুরুর 'প্রাইভেট' নাটক। দোষেগুণে অহংকারে রাগ দ্বেষ শোক ক্ষমা নির্লিপ্তিতে গুরু আমাদের মতই মানুষ ছিলেন এ তো জানা কথা, কিন্তু অরূপরতনের মধ্যে আমি এ সব কিছুর একটা আহূতি দেখতে পাই, এসমস্ত ফেলে চলে গুরু যেন চললেন, একটা বোয়িং যেন অনেকক্ষণ রানওয়েতে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ টেক অফ করল। আর স্টেজে এরোপ্লেন নামানোর হ্যাপা করবে কোন নাট্যদল !

সাহিত্যের যে সমস্ত মূল উপপাদ্য বলে আজ মনে করা হয়, অর্থাৎ মানুষের মনের

গতি, তার নানা রঙ, লোভ মোহ রিরংসা ভালবাসা, এসমস্ত সহজ ব্যাপার নয় স্বীকার করি। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এবং খানিকটা পরের সময় থেকে বাঙ্গালি লেখকেরা এসমস্ত নিয়ে পড়লেন। এবং রিপুদলের দিকে কিছু বেশিই নজর দিলেন। বোদলেয়রের 'ক্লেদজ কুসুম' নিয়ে কিছুদিন হইহই হল। যার ধাক্কা আজো কাটেনি, সমসাময়িক পত্রপত্রিকার পাতা খুললেই অচিন্ত্যকুমার-মানিক-শৈলজানন্দের উত্তরাধিকার আজো পাওয়া যায়। মানুষ যে কীটপ্রবৃত্তি শিশ্নোদরপরায়ণ পাদপাবরোহীত প্রাইমেট তা মনে করিয়ে দেওয়ার লেখকের অভাব হয়নি আজো। কিন্তু সত্যি বলতে কি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে যা বাস্তব, সকরুণ মনে হত আজ সেটাকেই মনে হয় বড় সাজানো, ক্লিশে। কারণ জীবনের পরাজয়ের কাহিনীও আজ আমাদের কাছে পুরনো, ফিকে হয়ে এসেছে। কুবের মাঝির গল্পের পাঠক আজ আর নেই, 'সরীসৃপ' এর মধ্যবিত্তের অবক্ষয় এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। আমরা মোটামুটি ধরেই নিয়েছি, সাউথ সিটিতে উইকেন্ডে মাল্টিপ্লেক্সের সিটে চিকেন সাওয়ারমা খাওয়াই পরমব্রহ্ম, অবক্ষয়ের যা দায় সব মুখ্যমন্ত্রীর। এই সময়ে দাঁড়িয়ে মানিকবাবুর কলম চলত বলে মনে হয়না।

কিন্তু এখানে স্মর্তব্য আরো একটা ব্যাপার। মানিকবাবু মিশ্র সাধু ভাষায় লিখতেন, যে ভাষা বলতে গেলে একরকম রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি, এবং পরবর্তীকালে বিভূতিভূষণ, শরদিন্দু, জগদীশ গুপ্ত, বনফুল যে ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ 'প্রাগৈতিহাসিক' এর শেষটা

> হয়তো ঐ চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল, এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনদিন পাইবেওনা।

বাঙ্গলা ভাষার পাঠক মাত্রই 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের ঐতিহাসিকতা স্বীকার করবেনন,

বিশেষতঃ এই উপসংহারটুকু, যা বাংলা ছোটগল্পকেই নিয়ে গেছিল পরের ধাপে। এবার এটাকেই যদি আজকের চালু বাংলায় লিখি

> হয়তো ঐ চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মায়ের পেট থেকে সংগ্রহ করে শরীরের মধ্যে লুকিয়ে ভিখু আর পাঁচী পৃথিবীতে এসেছিল, এবং যে অন্ধকার তারা সন্তানের মাংসের শরীরের মধ্যে গোপন রেখে যাবে তা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো তার নাগাল পায় নি, কোনদিন পাবেওনা।

একটু রসের হানি হল কি? আমি ঠিক বুঝিনা, সাধুভাষার একটা আলাদা এফেক্ট আছে ঠিকই, কিন্তু সেটা কোথায় এবং কতটা সেটা ধরতে পারিনা। হয়তো ভিখু আর পাঁচীর মত সমাজের সবচেয়ে 'নিচুতলার' মানুষদের কাহিনী যখন একটা তৎসমঘেঁষা 'উঁচুতলার' ভাষায় বর্ণিত হয়, তখন এর বৈপরীত্য (irony) টাই কানে বাজে। মানিকবাবু কঠিন গদ্য লিখতেন এমন অভিযোগ কেউ করেনা, কিন্তু সেই একই সাধুভাষায় মাত্র দু চারটে সংস্কৃত সন্ধি সমাস ছেড়ে বঙ্কিমবাবু বাংলার সেরা ডেন্টিস্ট এর দুর্নাম কুড়োলেন।

এখন যদি কেউ সাধুভাষায় লেখা তবে সেটা একটা ভান বলেই ধরে নেওয়া হয় (যেমন আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়)। তার কারণ সাধুভাষার আর চর্চা নেই, বর্তমানের লেখকেরা সাধুভাষার নামে একগাদা তৎসম শব্দ চালিয়েই কৈবল্যানন্দ লাভ করেন ('ভারতবর্ষ'-র বদলে 'জম্বুদ্বীপ', 'কালো'-র বদলে 'অসিত' ইত্যাদি)। অন্যদের কথা বলি কিকরে, আমি নিজে সাধুভাষায় লিখতে গয়ে বাঙ্গলার বদলে কোয়ার্টার সংস্কৃত উৎপাদন করেছি কত (যদিও সংস্কৃতে আমার জ্ঞান গাবৌঃ তে গিয়ে গয়াপ্রাপ্ত) ! সাধুভাষাতে যে নিতান্ত সাধারণ লোকের গল্পকে অসাধারণত্ব দেওয়া যায়, তার শেষ নিদর্শন বোধহয় শরদিন্দুবাবু।

এরকম আরো একটা ব্যাপার বাংলা সাহিত্যে এখন চলছে, যাকে নাম দেওয়া যাক 'কুথাসাহিত্য'। মহাশ্বেতা দেবী সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করেছিলেন, কিন্তু মাঝপথে ধারাটার খেই কোথায় যেন হারিয়ে গেল। প্লট খুব সরল, সাওতাল পরগণা কি

পুরুলিয়ার আদিবাসী গ্রাম, কথায় কথায় 'কুথা', 'বিটি', 'মহুয়া', 'মাদল', আর সভ্যতার বাইরে এক জীবনের হাতছানি। প্রায়শই দেখি, উদ্দাম সেক্সের যে কাহিনীটা সোদপুরের পটভূমিতেও লেখা যেত, চক্ষুলজ্জার খাতিরে লেখক সেটাকে শালবনি কি সারেঙ্গা কোথাও টুসু উপজাতির মাঝে গিয়ে ফেললেন। ব্যাপারটা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে 'কুথা' দেখলেই পাতা উলটে যাই। শৌখীন মজদুরি আর সহ্য হয়না।

বাংলা ভাষা অপেক্ষাকৃত নতুন, বাংলা হরফ দুশো বছর এখনো পার করেনি। এই সময়ের মধ্যে বাংলা সাহিত্য যতদূর এগিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। সাহিত্যের যেটা অপেক্ষাকৃত 'প্রথম ভাগ', অর্থাৎ গল্প কবিতা নাটক উপন্যাস, তাতে বাংলা সাহিত্য ডিস্টিংশন পেয়েছে সন্দেহ নেই। এরপরে যেটা বাকি, তাতে শুধু সাহিত্যিকের একার ক্ষমতায় কুলোবেনা। বিজ্ঞান। দর্শন। ইংরেজিতে যে ধারাটাকে বলে 'popular science'। বঙ্কিমবাবু বিজ্ঞানরহস্য লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপরিচয়, কিন্তু তার পর থেকে ধারাটা হেজেমজে শুকিয়ে গেল। তার কারণ এই, আজকের এই 'স্পেশালাইজেশন' এর যুগে ভূয়োদর্শীর জায়গা নেই। দান্তে থেকে শুরু করে তিমিমাছ, এমন বিরাট জ্ঞানের ব্যাপ্তি নিয়ে শেষ এসেছিলেন নারায়ণ সান্যাল। তারপর থেকে বাকিরা সবাই 'স্পেশালাইজড'। অনেকেই পেশাদার কবি, কেউ কবি কাম ঔপন্যাসিক, কেউ শুধ 'ধারাবাহিক উপন্যাস' লেখেন, হাতেগোণা রম্যরচনাকার। প্রাবন্ধিক প্রায় নেই। আর বিজ্ঞান বছরে একবার শুকতারা কি আনন্দমেলার পূজাবার্ষিকীতে জায়গা পায়। ইংরিজি ভাষায় কার্ল সেগান, রিচার্ড ডকিন্স বা আইজ্যাক অ্যাসিমভ যা করে গেছেন, তার তুলনা আমাদের ভাষায় নেই। কারণ বিষয়টা কঠিন, এবং এদেশে সেই কঠিন বিষয়টা যারা বোঝেন তাঁরা আরো কঠিন। তাঁরা জ্ঞানের এমনই সুউচ্চ সৌধচারী যে সাধারণ মানুষের কাছে নেমে আসতে তাঁদের বাধে। যুগে যুগে বিজ্ঞানীরা অতুল

সাহিত্যকীর্তি স্থাপন করেছেন, যে সে গল্প উপন্যাস নয় – ইউক্লিডের জ্যামিতি, গ্যালিলিওর ডায়াগ্রামা, নিউটনের প্রিন্সিপিয়া, ডারুইনের অরিজিন অফ স্পিসিস, আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি, স্টিফেন জে. গোল্ডের ওয়ান্ডারফুল লাইফ, অ্যাসিমভের ফাউন্ডেশন সিরিজ, ডকিন্সের সেলফিশ জিন – এসমস্ত শেক্সপীয়র কি গার্সিয়া মার্কেজের চেয়ে কম পঠিত নয়। এবং সবদিক বিচার করলে দেখা যাবে এই সমস্ত বই মানবসভ্যতাকে যতদূর প্রভাবিত করেছে, কোন কবি ঔপন্যাসিক তত করে উঠতে পারেননি। কিন্তু আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা, যাদের ভরা ঘড়া থেকে জ্ঞানের ছিটেফোঁটা যদি চলকে পড়ে এই আশায় মুখিয়ে আছি, তাঁরা সাহিত্যবিষয়ে চরম উদাসীন। বিজ্ঞানী যদি কবি না হন তবে আর রইল কে? কঠিনকে সহজ করতে যদি তাঁরাই অপারগ হন, তাহলে আমরা তো অথৈ জলে ! জানার, বোঝার, শেখার সমস্ত আশা ছেড়ে খালি প্যানপ্যানে কবিতা আর ঘ্যানঘ্যানে উপন্যাস পড়েই জীবনপাত করতে হবে।

এই চেষ্টা বাংলাতে কেউ কেউ করেছেন। স্কুলপাঠ্য বইকে আমি সাহিত্যের মধ্যেই ধরি, অন্ততঃ 'সাহিত্য'-র ছোঁয়া না থাকলে সে বই 'পাঠ্য' হওয়া উচিত নয়। কারণ বিষয় অঙ্কই হোক কি গীতিকবিতা, লেখা মাত্রই লেখক ও পাঠকের খানিকক্ষণের রাঁদিভু । সাহিত্য বিনা সেটা হয়ে ওঠে অফিসের বোর্ড মিটিং। কোন কোন লেখক, যেমন কেশবচন্দ্র নাগ কিম্বা অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় ব্যাপারটাকে ক্যান্ডেললাইট ডিনারের স্তরে নিয়ে যেতে পেরেছেন। কিন্তু যথারীতি এক্ষেত্রেও ইংরিজি আমাদের দশ গোল মেরে বসে আছে। সাউথ পয়েন্টের ক্লাস সিক্সের ইংলিশ গ্রামার বইয়ের লেখক প্রখ্যাত সাহিত্যিক রোনাল্ড রিডআউট। তার স্বাদ যেন এখনো জিভে লেগে আছে। নাউন প্রোনাউন আর অ্যাডভার্বের কচকচানি নয়, শুধুমাত্র মজলিশি আড্ডা গল্পচ্ছলে ভদ্রলোক আমায় ইংরিজি শিখিয়েছিলেন। ডি রবার্টিসের মলিকিউলার বায়োলজি, রেসনিক হ্যালিডের

ফিজিক্স, অথবা স্ট্রিকবার্জারের ইভলিউশন, সারা বইটা যেন একটা অখন্ড উপন্যাস ! অণু পরমাণুগুলোকে এক একটা চরিত্র করে তারা যেন কথা বলিয়েছেন। এমন বই আমার নিজের ভাষায় কবে পাব তার লাগি পথ চেয়ে আছি। 'বিশ্বপরিচয়' না হোক, 'অব্যক্ত'-র মত বিজ্ঞানকাব্যও যদি দুটো একটা পাওয়া যায় !

এই সমস্ত বইয়ের এত নাম করছি বলে মনে করবেননা যে লাইব্রেরি থেকে এনে আজই পড়তে বসে যাবেন। 'সহজ করে লেখা' মানে কঠিনটাকে বাদ দেওয়া নয়। যেখানে আড়াইপাতা অঙ্ক কষার সেখানে এঁনারা চারপাতা কষেছেন। ফিজিক্সের এমন এমন কূট হাজির করেছেন যা ভাবতে গেলে ঘেমে উঠি। এই সমস্ত বইয়ের মধ্যেই 'কঠিন' তার স্বমহিমায় বর্তমান। কিন্তু বর্ণনার গুণ বলে যে একটা কথা আছে, সংস্কৃত কাব্যে যাকে বলেছে 'রস', যে মজলিশি ধারাটা বাংলায় মুজতবা আলীর সাথেই শেষ হয়েছে, সেটা এমনই বস্তু যে পাথরের থেকেও শিরাজি বার করে আনে। কিন্তু হায়, এর কোন ফর্মুলা নেই। চটজলদিতে একাজ হয়না। শুক্তির মত সারাজীবনের জ্ঞানতপস্যার সঞ্চয় জমাট বেঁধে যে মুক্তো, তার কোন মেড ইজি নেই।

সহজ কি কঠিন !

সুভাষ হাট, অরুণাচল, ২০১৪

বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ

সূচনাঃ ল্যামিনেশন করাতে গিয়েই আটকে গেল সুরেখা।

"এই একটা পাতা পঁচিশ টাকা !" - সুরেখার গলায় অবিশ্বাসের স্বর - "জেরক্স করাতে তো ষাট পয়সা নেয় !"

"এটা জেরক্স নয় দিদি, ল্যামিনেশন" - দোকানদার বিরক্ত - "আগে করিয়েছ কখনো!"

না, আগে কখনো ল্যামিনেশন করানোর প্রয়োজন হয়নি সুরেখার। কিই বা আছে তার। মাধ্যমিক পাশের সার্টিফিকেট, মার্কশিট, অ্যাডমিট কার্ড। সবই একটা খবরের কাগজে মুড়ে তোরঙ্গের ভিতরে রাখা। কেউ দেখতে চায়নি কখনো।

কিন্তু এ কাগজটা ল্যামিনেট না করালেই নয়। ট্রেনে বাসে ঘষা খেতে খেতে ছিঁড়ে যাচ্ছে। সুমির প্রেসক্রিপশন। সরকারি হাসপাতালের স্ট্যাম্প। দেখালে বিশ্বাসযোগ্যতা একটু বাড়ে। সুমির যে সত্যিই 'লিউকিমিয়া' (বলতে বলতে নামটা এখন সুরেখার অভ্যাস হয়ে গেছে) হয়েছে তা জনতার কাছে প্রমাণ হয়।

কায়দাকানুন গুলো সুরেখা শিখেছে হাসপাতালেই এক মাসির থেকে। "শোন্ সবসময় প্রেসক্রিপশন দেখাবি। পয়াসা পাবি। এমনি এমনি মেয়ে কোলে ট্রেনে ঘুরলে লোকে ভাববে ভাঁওতা। ভাল শাড়ি একদম পরবিনা। চুল বাঁধবিনা।"

ভাল শাড়ি অবশ্য সুরেখার নেই। কিন্তু চুল ? প্রচুর অনিদ্রা অনাহার সহ্য করেও সুরেখার এখনো কোমর অব্দি চুল। না বেঁধে উপায় কি ? মেয়েকে নিয়ে ট্রেনে ওঠাও এক হ্যাপা। সুরেখা বালিগঞ্জ স্টেশন থেক দু চারবার ওঠার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। এখন আপ ট্রেন ধরে শিয়ালদা যায়। তারপর ফাঁকা ট্রেন ধরে ডাউনে আসে। একটু সময় নষ্ট হয় ঠিকই। কিন্তু সুমিকে না নিয়েও তো উপায় নেই। ডাক্তার বলেছে সুমির রাস্তায় বেরনো বারণ, ইমিউনিটি খুব উইক, যেকোন

সময় সর্দিকাশি হয়েই মরে যেতে পারে। তবুও খুব সাবধানে, ক্যাপ মাস্ক লাগিয়ে সুমিকে ট্রেনে ওঠায় সুরেখা। রুগীর জলজ্যান্ত উপস্থিতি ছাড়া রোগ প্রমাণ করা কঠিন।আসলে লোকে এখন চালাক হয়ে গেছে। অপাত্রে দান করতে চায়না কেউ। রীতিমত কাগজপত্র সাক্ষীসাবুদ দেখিয়ে ভিক্ষা করতে হয়।

আচ্ছা চিকিৎসাবিজ্ঞান তো অনেক উন্নতি করেছে। গরিবের ঘরেই কেন 'লিউকিমিয়া' হয় ? তার ওষুধ এত দামী কেন ? ওষুধের দাম কে ঠিক করে? 'ওষুধের দাম' বলে কিছু হয় কি ? সময় পেলেই সুরেখা এসব ভাবে। অবশ্য খুব বেশি সময় পায়না। সকালে চারবাড়ি কাজ। তারপর সারাদিন ট্রেনে ট্রেনে।

কিছু নিত্যযাত্রী সুরেখাকে চিনে গেছে। সুরেখাকে দেখলে সিট ছেড়ে দেয়, গল্প করতে চায়। ভাবখানা এমন, সব মিটে গেছে। তাদের ধারণা, এতদিন ধরে কারো চিকিৎসা চলতে পারেনা। এবং এ বিশ্বাসটা তারা বাকিদের মধ্যে সংক্রামিত করে। এদের কারোকে দেখলে সুরেখা কামরা থেকেই নেমে যায়। সুমির 'সেরে যাওয়া' নেই - সেটা এরা বুঝবেনা। ডাক্তার বলেছিল হাড়ের ভিতর থেকে কিসব বার করে নতুন রক্ত পুরে দেবে, কিন্তু তার খরচের মাত্রাটা সুরেখার গোণাগুণতির সীমার বাইরে। 'সেরে যাওয়া'-র ব্যাপারটা আর মাথায় আনেনি সুরেখা।

সুরেখার মনে মিথ্যে আশা কিছু নেই। সুমির আয়ু নিয়ে কোন বিভ্রমও নেই। মেয়েকে আরো একটা দিন বাঁচিয়ে রাখতেই তার সমস্ত জীবনীশক্তি খরচ হয়ে যায়। তা হোক। ল্যামিনেট করতেই হবে। ফাউন্ডেশনকে বললে কি করে দেবে? মনে হয়না। ওদের পয়সায় সুমির খাওয়াপরাটুকু হয়ে যায়। যাকগে, যা পাওয়া যায়।

অজ্ঞানের অন্ধকার দূরীকরণে বিজ্ঞানঃ 'সবুজ ফাউন্ডেশন' এর সেক্রেটারি বিনয়ের কাছে এরকম চিঠি কালে কচ্চিৎ আসে। একেবারে সুইডেন থেকে চিঠি,

যাকে বলে বাঘা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, একেবারে তাই। ফার্মা জায়েন্ট। এদের ব্র্যান্ড নেম দিয়েই প্রচুর ওষুধ বাজারে চলে। বেশ কিছু ওষুধ আর স্বনামে নয়, এদের ব্র্যান্ড নেম দিয়েই চলে। অতএব চিঠিটা পড়ে বিনয় একটু বেশিই উৎসাহিত হয়ে পড়ল। টং করে ঘন্টা বাজাতেই বিনয়ের পিএ অর্চনা ঘরে ঢুকল।

"আমাদের হাতে এখন লিউকিমিয়া কটা আছে?" - বিনয়ের প্রশ্ন।

অর্চনা খাতার কয়েকটা পাতা উলটে বলল - "চারশো বাইশ।"

বিনয় মনে মনে হিসেব করে নিল। কোম্পানি পাঠিয়েছে দেড় বছরের ট্রায়াল প্রোগ্রাম। প্রতিমাসে পার পেশেন্ট তিনশো ডলার করে - বিনয়ের মাথা ঘুরে গেল। অনেক টাকা। সুইডেনে ক্লিনিকাল ট্রায়ালের যে রেট, সেই হিসেবেই কোম্পানি প্রোপোজাল দিয়েছে। নতুন ওষুধ, টেস্ট করার জন্য ভলান্টিয়ার চাই। কোম্পানি পয়সা দেবে প্রত্যেককে। দেড় বছর পরে জানা যাবে, ওষুধে কাজ ধরেছে কিনা। বিজ্ঞান ও বিনয় দুজনেই খানিকটা এগোবে। এখানকার যা পেশেন্ট - ওরা ডলার ফলার বোঝেনা। ফ্রি-তে ওষুধ পাচ্ছে এতেই খুশি খুশি বাড়ি চলে যাবে। একটা গোপন পুলকে বিনয়ের মন নেচে উঠল।

"হুঁ" - বিনয় একটা ছদ্ম গাম্ভীর্য্য মেনটেন করে বলল - "ডক্টর মন্ডলকে এখনই ফোন লাগাও। কন্ট্রাক্টের টার্মস আজই ফাইনাল করে নেবে। এই যে প্রোপোজাল, ভাল করে পড়ে নাও।" - খানিকটা দম নিয়ে বলল - "এই ট্রায়াল ছাড়া যাবেনা। কাল থেকেই এক এক করে পেশেন্ট ডেকে কনসেন্ট ফর্মে সই করাবে।"

অর্চনা একবার কাগজটায় চোখ বুলিয়ে বলল - "টাকার ব্যাপারটা কি কনসেন্ট ফর্মে থাকবে?"

"অবশ্যই। না হলে কোম্পানি পুরো ট্রায়ালটাই বাতিল করে দেবে। ইংরাজিতে লিখবে, ছোট ছোট টাইপ করবে। পেশেন্টকে শুধু বলবে দেড় বছর ফ্রি-তে ওষধ

পাবে।”

অর্চনা বেরিয়ে নিজের টেবিলে বসে একটা নম্বর ডায়াল করল। এই কাজটাই কঠিন, এই ফোন কলটা ঠিকমত উতরে গেলেই বাকি ট্রায়ালটা জলের মত সোজা।

“হ্যালো” - একটা গমগমে স্বর ওপার থেকে ভেসে এল - “ডঃ মন্ডল স্পিকিং।”

“গুড মর্নিং স্যার, আমি সবুজ ফাউন্ডেশন থেকে বলছি।”

“আরে অর্চনা, এক মিনিট” - খানিকক্ষণ কাগজপত্র নাড়াচাড়া করার শব্দ - “হ্যাঁ, কেমন আছ বলো।”

এর জবাবে কি বলবে অর্চনার মাথায় আসেনা। তব বাধা উত্তর একটা দিতেই হয়।

“এই চলে যাচ্ছে স্যার। আপনারাই রেখেছেন।”

“আরে আরে কি যে বলো! তোমার মুখ থেকে এসব শুনতে ভাললাগেনা। আচ্ছা কখন ফ্রি আছ বলো।”

লোকটা এরকমই, যতবার কথা বলে ততবার অর্চনার একই অভিজ্ঞতা। “স্যার আসলে একটা ক্লিনিকাল ট্রায়ালের ব্যাপারে কথা ছিল।”

“হ্যাঁ, চিঠিটা আমার কাছেও এসেছে।”

“স্যার” - অর্চনা এই মুহূর্তটাতেই একটু ইতস্তত করে - “আপনি যদি ফাইনাল করে দেন ...”

“এতে আর বলার কি আছে। সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট আমার স্ট্যান্ডার্ড। বিনয় জানে সব। তোমাকে এসব বলতে কেন যে পাঠায়!”

“স্যার যদি একটু কম করেন” - এইবার অর্চনার আসল পরীক্ষা - “মানে স্যার, পেশেন্টদেরও তো কিছু...”

“দেখো অর্চনা”, ডক্টর মন্ডলের রাগত স্বর - “তুমি বলছ নিয়ে এ নিয়ে তাও কথা বলছি। বিনয়কে বলবে, সিক্সটির কম করলে আমি কিন্তু নাম উইথড্র করে নেব।

আমার হাতে আরো অনেক এন জি ও আছে।”

“অফকোর্স স্যার” - অর্চনা আত্মসমর্পণ করল - “তাহলে আমি কাগজপত্র রেডি করে ফেলছি।”

“হ্যাঁ, আজ সাড়ে সাতটার সময় মেনল্যান্ড চায়নায় চলে এসো। ওখানেই সইসাবুদ করে নেব। বিনয়ের আর আসার দরকার নেই।”

“ইয়েস স্যার” - অর্চনা একটু নার্ভাস - “তাহলে রাখি এখন ?”

“আরে অত স্যার স্যার কোরনা। কল মি জয়, জাস্ট জয়।”

“ইয়েস স্যার, গুড ডে স্যার।”

আধুনিক সভ্যতায় বিজ্ঞানের অবদানঃ ডক্টর জয়দীপ মন্ডল অনুব্রতকে ডেকে পাঠালেন।

অনুব্রতর ছোটখাটো চেহারা। মোটা চশমা। সদ্য পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করতে ঢুকেছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসের পুরনো চাকুরে। সাতবছর ধরে তিনটে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ম্যানেজ করেছে। কলকাতায় ফিরে এখনো ঠিক মানিয়ে নিতে পারছেনা।

“শোন” - ডক্টর মন্ডল অনুব্রতকে একটা কাগজের তাড়া ছুঁড়ে দিয়ে বললেন - “ফেজ ফোর ক্লিনিকাল ট্রায়াল করতে হবে। একদম নতুন ড্রাগ। তোর থিসিসটাও হয়ে যাবে।

অনুব্রত একবার ব্রশিওরের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। বেশ রংচঙ্গে। একটা রকেট বায়ুমন্ডল ভেদ করে প্রচুর ধোঁয়া ছেড়ে মহাশূন্যে উড়ে যাচ্ছে। লিউকিমিয়ার একটা বিশেষ ধরনের জন্য ওষুধ। এখনো অব্দি জন্তুজানোয়ারের ওপর টেস্ট করা হয়েছে মাত্র।”

“স্যার,” - অনুব্রত গলা খাঁকরে বলল - “ফার্স্ট টার্মের শেষে সারভাইভাল মাত্র

পয়তাল্লিশ...”

“পি ভ্যালু দেখ না ! মারমার কাটকাট করে দেবে ওষুধ। ও নিয়ে ভাবতে হবেনা।”

“স্যার, পি ভ্যালু তো শুধু যাদের ওষুধ দেওয়া হয়েছে আর হয়নি তাদের কমপারিজন।”

ডঃ মন্ডল চেয়ার ছেড়ে উঠে ঠান্ডা গলায় বললেন - “অনব্রত, তুই বহুদিন চাকরি করেছিস। তিন বছর এখানেও থাকবি। পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। যা বলছি তাড়াতাড়ি করে ফেল।”

অনুব্রত খানিকক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে তারপর কোন কথা না বলেই বেরিয়ে গেল। ডক্টর মন্ডল ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। একটা ট্রায়াল রান করা যে কি ঝামেলা এরা বোঝেনা। এথিকাল কমিটি, ড্রাগ কন্ট্রোলার, ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অথরিটি - সমস্ত জায়গায় প্রসাদ। তার ওপর পেশেন্ট সামলানো। পান থেকে চুন খসলেই কোম্পানি অন্য কোথাও বরাত দেবে। ডক্টর মন্ডল ঘেমে উঠলেন। নাঃ, কাগজপত্রের ব্যাপারটা নিজেকেই দেখতে হবে।

বিজ্ঞানের কালো দিকঃ “স্যার, একটা প্রবলেম হয়ে গেছে” - অনুব্রতর কাঁপা কাঁপা গলা - “ চারজন ভলান্টিয়ারের স্টিভেন জনসন ডেভেলপ করেছে, তাদের মধ্যে একটা ছ বছরের বাচ্চা।”

“ও শিট” - ডক্টর মন্ডল চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন প্রায় - “হাইড্রোকর্টিসোন লাগিয়েছিস? আইভিআইজি-র ব্যবস্থা কর।”

“স্যার” - দ্বিধাজড়িত স্বরে অনুব্রত বলল - “এরা যে ক্লাস তাতে আইভিআইজি কিনতে পারবে বলে মনে হয়না।”

“নিকুচি করেছে, স্টিভেন জনসনে একটাও মরলে পুরো ট্রায়াল বানচাল হয়ে যাবে

। আমি এম আর পাঠাচ্ছি, আইভি আই জি নিয়ে আসবে। তুই ততক্ষণ অবসি কোনভাবে ম্যানেজ করে দে।”

ডক্টর মন্ডল ফোন রেখেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। অনেকদিন পর তার বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করতে লাগল। চারটে স্টিভেন জনসন বাঁচানো টাফ। আর তারপরেই আসল সমস্যা। মিডিয়ার কাছে লিক হয়ে গেলেই – ডক্টর মন্ডল ঘেমে উঠলেন। ওষুধের ট্রায়ালে মৃত্যু, এদেশের পাবলিক এখনো এটা মেনে নিতে পারবেনা। এত টেনশনের মধ্যেও ডক্টর মন্ডলের হাসি পেল। ট্রায়াল ছাড়া কি বিজ্ঞান এগোবে। আর ট্রায়াল মানেই এরর। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ডক্টর মন্ডলের।

ওয়ার্ডের সামনে একটা জটলা। ভিড় ঠেলে ডক্টর মন্ডল পার্টিশন করা বেডগুলোর দিকে এগোলেন।অনুব্রত যেন আধখানা হয়ে গেছে, শঙ্কিত চোখে ডক্টর মন্ডলের দিকে তাকালো। তারপর একটা বেডের দিকে নির্দেশ করল।

একটা বাচ্চা মেয়ে। সারা শরীরটা বড় বড় ফোসকায় ছেয়ে গেছে। দু চার জায়গায় চামড়া খুলে বেরিয়ে এসেছে। ঠোঁট নেই, তার জায়গায় জমাট রক্তের ডেলা। চোখের পাতাগুলো আলগা হয়ে এসেছে। একটা শূন্য দৃষ্টি ছাদে নিবদ্ধ। স্যালাইন সেট পাশে খুলে রাখা।

ডক্টর মন্ডলের অভ্যস্ত চোখও শিউরে উঠল। দৃশ্যটার মধ্যে যেন অতিপ্রাকৃত কিছু একটা ছিল। ডঃ মন্ডল খানিকটা টাল খেয়ে পাশের বেডে বসে পড়লেন। পরবর্তী পদক্ষেপগুলো তার মাথায় কেমন একটা জট পাকিয়ে হিজিবিজি হয়ে যাচ্ছে। মনের সমস্ত শক্তি জড়ো করলেন ডক্টর মন্ডল।

“ডেথ সার্টিফিকেট বানিয়েছিস?”

“না স্যার, আপনার জন্যে ওয়েট করছিলাম।”

“গুড” - ডক্টর মন্ডল এক মুহূর্ত ভেবে নিলেন - “স্টিভেন জনসন কিছুতেই

লিখবিনা। ক্যান্সারের নেচারাল কোর্সেই ডেথ, বুঝলি। এমনিতেও ছমাস বাঁচত।”

অনুব্রত গলা খাঁকরে কিছু একটা বলতে গেল।

“কি?” - ডক্টর মন্ডল আর ধৈর্য্য রাখতে পারলেননা।

“পেশেন্ট পার্টিকে যখন বডি হ্যান্ডওভার করব ··· যদি না মানে ? মেয়েটার কন্ডিশন এত খারাপ !”

এ ব্যাপারটা ডক্টর মন্ডলের মাথাতেই আসেনি।

“পার্টিকে ডাক। আগে বডি কভার করে দে।”

অনুব্রত সুরেখাকে নিয়ে ভেতরে এল। ডঃ মন্ডল একবার মেপে নিলেন। না, কোন থ্রেট দেখা যাচ্ছেনা। বোঝালে খেয়ে যাবে।

“আপনি সুরেখা বিশ্বাস?” - মৃত্যুসংবাদ দেওয়ার সময় ডক্টর মন্ডল একটা অথরিটেটিভ গাম্ভীর্য্য বজায় রাখেন। তাতে পার্টি বেশি ট্যাঁ ফো করতে পারেনা - “ভেরি সরি” - ডক্টর মন্ডল শ্বাস নয়ে বললেন - “নতুন ওষুধ টেস্ট করার আগেই আপনার মেয়ে... খুব অ্যাডভান্স স্টেজ তো!”

সুরেখার খুব একটা ভাবান্তর দেখা গেলনা।

“পোস্টমর্টেম করার জন্য দুদিন ওকে এখানে রাখতে হবে” - ডক্টর মন্ডল মনে মনে ভেবে নিলেন। দুদিনে প্রকৃতির নিয়মেই সমস্ত প্রমাণ লোপ হয়ে যাবে, স্টিভেন জনসনের কোন চিহ্নই থাকবেনা।

সুরেখা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল - “মেয়েকে দেখব।”

এই কথাটারই ভয় করছিলেন ডক্টর মন্ডল। কি উত্তর দেবেন ভেবে ওঠার আগেই অনুব্রত সুমির মুখের থেকে কাপড়টা উঠিয়ে দিল। ডক্টর মন্ডল বাইরে গিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন।

উপসংহারঃ "সিক্সটি সেভেন পার্সেন্ট কিওর, ফার্স্ট টার্মের শেষে সারভাইভাল সিক্সটি টু।" - অনুব্রতর স্বর হলঘরের মাঝে গমগম করছে। ডক্টর মন্ডল সামনের সারিতে বসে। অনকোলজি কনফারেন্স। বিশিষ্ট ক্যান্সার স্পেশালিস্ট ছাড়াও সমস্ত ফার্মা কোম্পানির হোমরাচোমরা, ড্রাগ কন্ট্রোলার। পাশের ঘরে বুফে। বিরিয়ানির সুবাস লিক করে হলঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। সকলেই ঘড়ি দেখছেন। কোনক্রমে অনুব্রতর সেশনটা শেষ হলেই... । ট্রায়াল সাকসেসফুল। আর এক সপ্তাহের মধ্যেই ড্রাগ কন্ট্রোলারের অ্যাপ্রুভাল এসে যাবে। আগেরবার কোম্পানি ওবেরয় শেরাটনে ককটেল করেছিল। এরা হয়তো সুইডেনেই নিমন্ত্রণ করে বসল। উত্তেজনায় ডক্টর মন্ডল চেয়ারের মধ্যেই নড়েচড়ে বসলেন।

হঠাৎ হলঘরে একটা চাপা গুঞ্জন। লাঞ্চটাইম হয়ে গেল নাকি? ডক্টর মন্ডল ঘড়ি দেখলেন। না, এখনো পাঁচ মিনিট। অনুব্রত কি বলছে তাহলে? ডক্টর মন্ডল স্ক্রিনের দিকে তাকালেন। সঙ্গেসঙ্গে তার সারা শরীর যেন একতাল বরফের মত জমে গেল।

পর্দার ওপর একটা বাচ্চা মেয়ের মুখ। সারা শরীরটা বড় বড় ফোসকায় ছেয়ে গেছে। দু চার জায়গায় চামড়া খুলে বেরিয়ে এসেছে। ঠোঁট নেই, তার জায়গায় জমাট রক্তের ডেলা। চোখের পাতাগুলো আলগা হয়ে এসেছে। একটা শূন্য দৃষ্টি ছাদে নিবদ্ধ। স্যালাইন সেট পাশে খুলে রাখা।

"আটজন পেশেন্ট স্টিভেন জনসন ডেভেলপ করার পর আমরা ট্রায়াল বন্ধ করতে বাধ্য হই" - অনুব্রত একটা একটা করে শব্দ উচ্চারণ করল। ডঃ মন্ডল টের পেলেন, তার হৃৎপিন্ডের তিন চারটে বীট মিস হয়ে গেছে। শেষ স্লাইড। থমথমে গলায় অনুব্রত পড়ে শোনাল - "নট রেডি ফর ক্লিনিকাল ইয়ুজ।"

দুটো স্লাইডের মধ্যেই ডক্টর মন্ডলের ট্রায়াল শেষ হয়ে গেল।

হলের মধ্যে কোলাহল। ফার্মা কোম্পানির প্রতিনিধিরা স্টেজের সামনে একটা

জটলা শুরু করেছে। হঠাৎ ডক্টর মন্ডলের ফোন বেজে উঠল। যদিও বেশি কিছু বলার ছিলনা। বারো তেরোবার "ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার" বলেই ক্লান্ত ডক্টর মন্ডল ফোন রেখে দিলেন।

সুরেখা তখন শুধু ল্যামিনেট করা প্রেসক্রিপশনটা নিয়েই ট্রেনে ট্রেনে ঘুরছে।

সুভাষ হাট, অরুণাচল, ২০১৪

অ রু ণা চ ল

“এই হল রডোডেনড্রন। এখান থেকে ষোল হাজার ফুট অব্দি খালি এই পাবেন।” - ড্রাইভার অন্ধ্রের লোক, হিন্দিতে তেমন দখল নেই। তার ব্যাখ্যানা থেকে যা বোঝা গেল তা হল তেরো থেকে ষোল হাজার ফুট হল রডোডেনড্রনের এলাকা। তারপর থেকে ন্যাড়া পাথর আর বরফ ছাড়া কিছু পাওয়া যাবেনা।

রডোডেনড্রন বিচিত্র গাছ। কোন গাছের সিংহভাগ জুড়ে যে শুধু তার মূল থাকতে পারে এ শুধু আমার সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে দেখা, আর এই এখানে। রডোডেনড্রন একলা গাছ নয়, ঝাড়, আর তাদের মূলগুলো পরস্পরের সাথে জড়িয়ে পরপর সিঁড়ির মত ধাপের সৃষ্টি করেছে। ইয়াক তার ওপর পা দিয়ে দিয়ে অনায়াসে পাহাড়ে ওঠে অবশ্য এটুকুনি সুবিধা না পেলেও ইয়াকের দিব্যি চলে যায়।

এছাড়া রডোডেনড্রনের যেটা দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সেটা হল এর উত্তল (convex) পাতা, যেগুলো প্রায়শঃ নিচের দিকে একটু বাঁকানো। বরফ যাতে পাতা থেকে সহজেই গড়িয়ে যায়, সেজন্য এই অভিযোজন। যেকারণে অরুণাচলের পাহাড় কাশ্মীর কি হিমাচল প্রদেশের থেকে আলাদা। লাদাখ সিয়াচেনের মত দিগচক্রবালব্যাপী সাদা পটচিত্র অরুণাচলে পাওয়া যাবেনা। বরফের স্তর যতই মোটা হোক, রডোডেনড্রনের পাতাগুলো তার ফাঁক দিয়ে জেগে থাকে ঠিক। অবশ্য বাকি সমস্ত গাছপালা এত সৌভাগ্য করে আসেনি। এই সময়টা অর্থাৎ অক্টোবরের শেষ থেকে সবুজ পাহাড়ে বাদামী রঙ ধরবে। তার মাঝে কোথাও হলুদ অর্কিডের ঝাড়, কোথাও একগোছা বেগুনী রঙের ফুল। অরুণাচল এখন রংপুর।

মাঝে ক্ষণিকের বিরতি, কিঞ্চিৎ জলযোগের পরে গাড়ি আবার চলল। গাড়ি বলতে

ধরে নেবেন না সেডান কি পন্টিয়াক। নগরসভ্যতা অরুণাচলে পৌঁছয়নি এখনো। প্রধানমন্ত্রীর 'স্বর্ণ চতুর্ভুজ' – এর কোন স্পর্শক বরাবরও নেই অরুণাচল। তাই চলার সাথে সাথে সামনে রাস্তা তৈরি করে নেওয়াও 'গাড়ি'-র কর্তব্যর মধ্যে পড়ে। আপাততঃ একখানা বিরাটকায় বুলডোজারের পিছনের সিটে বসে ঘটঘট করতে করতে চলেছি। সিটে বসে কিছু টের পাওয়া যায়না, কিন্তু ছোটবড় উপলখন্ড পদতলে চূর্ণ করতে করতে যাচ্ছি।

পাহাড়ি রাস্তা বলতেই মনের মধ্যে 'কাঞ্চনজঙ্ঘার' পাহাড়ি সান্যাল মনে পড়ে। নিরুদ্বিগ্ন মানুষটি স্যুটেড বুটেড হয়ে চুরুট মুখে রেলিং ঘেরা রাস্তা দিয়ে চলেছেন। চারিপাশ রৌদ্রোজ্জ্বল, শান্ত, কাঁচামিঠে ঠান্ডা। হঠাৎ একখানা নাম না জানা ডাহুকের ডাক শুনে তিনি থমকে দাঁড়ালেন, পকেট থেকে বাইনোকুলার বার করে চোখে লাগালেন। তারপর ছোট নোটবুকে লিখে রাখলেন। অথবা যারা কেদার বদ্রী চড়েছেন, তাদের মনে পড়বে রেলিং দেওয়া বাঁধানো সরু পিচের রাস্তা, চারপাশে জনপদ, তাতে হাজার সামগ্রী, থেকে থেকেই পুলিশ প্রহরা। অরুণাচল অভিলাষী, এসমস্ত মন থেকে একেবারেই বার করে দিন। বরং মনে করুন মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে', কাবুলের সেই পাকদন্ডী রাস্তা, সেই হাজার ফুটের খাদ, সেই ছিয়াত্তর ডিগ্রি চড়াই। মাঝেমাঝেই একটা দুটো গাড়ির ধ্বংসস্তুপ। যন্ত্রসভ্যতার প্রবেশ রোধ করতে প্রতিমুহূর্তে যেন প্রকৃতি ফন্দি আঁটছে। আজ যেটুকু পাথর পরিষ্কার করে মোটামুটি গাড়ি চালানোর মত পথ পাওয়া গেল, পরদিনই ধ্বস নেমে সে জায়গা বিলকুল ধুয়েমুছে সাফ। আবার এক হপ্তা রোলার বুলডোজার মিলে পাথর ফাঁক করে একচিলতে রাস্তা পাওয়া গেল। আধঘন্টার বৃষ্টিতে পাথরভাঙ্গা মিহি ধুলো হয়ে গেল দুফুট জমাট কাদা। তার মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালায় কার সাধ্য।

অতএব মাঝেমধ্যেই গাড়ি আটকে যাবে, কখনো এক দুদিনের জন্য। তখন তাঁবু খাটিয়ে দিবারাত্র নিসর্গের অসহ্য সৌন্দর্য্য অবলোকন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বঙ্গোপসাগরের থেকে উড়ে এসে যত মেঘ সারবেঁধে অরুণাচলের এই পাহাড়ের গায়ে আটকা পড়ে। চাই কি পকেটে কি জামার বোতামেও খানিক ঢুকে যেতে পারে। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে মেঘের মত ভাল খেতে খুব কম জিনিস আছে। বিশেষতঃ সাথে যদি খানিকটা ভ্যানিলা এসেন্স থাকে।

তাঁবুতে থাকার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে ও পথে পা না বাড়ানোই ভাল। তাঁবু নানাপ্রকার। এক হয় শুধু একটা ত্রিপল কি প্লাস্টিকের ম্যারাপ, মাঝখানে একটা বাঁশ পুঁতে খাড়া করে রাখা। যদি মাঝখাএ একটার বদলে চারটে বাঁশের ঠেসান লাগান, তখন ব্যাপারটা দেখতে হয় রেড ইন্ডিয়ানদের Teepee র মত। এজাতীয় তাঁবুতে রাত কাটানো আর খোলা আকাশের নিচে শোয়া একই ব্যাপার। তেমন তেমন হাওয়ালো জায়গা হলে সকালে উঠে এই তাঁবু খুঁজেই পাওয়া যাবেনা। বাইরে একজনকে পাহারায় রাখতেই হবে না জন্তুজানোয়ারের ভয় নেই, শুধু দমকা হাওয়ায় তাঁবুর গজালগুলো উপড়ে না দেয় তাই দেখার।

আর এক রকম তাঁবু, যাকে বলে 'অফিসার' তাঁবু, তা অবশ্য অতীব সুখপ্রদ। ক্যানভাস, প্লাস্টিক আর ত্রিপলের তিন স্তর, মেঝেতে কার্পেট, কেরোসিনের ফায়ারপ্লেস (যাকে বলে 'বুখারি', সম্ভবতঃ 'বুখার' থেকে শব্দটা তৈরি), আলাদা কামরায় পাশ্চাত্ত্য শৌচসম্ভার, সব মিলিয়ে তাঁবুত্তমা। অনেকটা কিং সলোমন্স মাইন্স ফিলমে যেমন দেখেছেন আরকি। যারা একটু বাইরে থেকেও ঘরে থাকার স্বাদ চান, এজাতীয় তাঁবু তাদের জন্যে। বেশিদূর নয়, গোয়ার কোলভা বিচে গেলেই সৈকতের ওপর সারি সারি এজাতীয় তাঁবুতে নিশিযাপন করতে পাবেন। তফাৎটা এই, সেখানে হঠাৎ হঠাৎ পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার ভয় নেই, সকালে উঠে তাঁবুর মাথা থেকে কুচি কুচি বরফ ঝেড়ে সাফ করার ঝামেলাও

নেই।

তবে যদি সত্যিই খাঁটি অরুণাচলী ধরণে রাত কাটাতে চান, গাড়ি যেখানেই থামবে তার থেকে কয়েকপা এগিয়ে কি পিছিয়ে কোন একটা গুম্ফায় ঢুকে গা এলিয়ে দিন। এখানে গুম্ফার বাড়বাড়ন্ত খুব, খানিক পরে পরেই একটা করে গুম্ফা কি বৌদ্ধমন্দির পাওয়া যাবেই। তবে গ্যাংটকে যে মহীয়ান গুম্ফা দেখে চোখ সার্থক করেছেন, তার সাথে তুলনা করতে যাবেননা। নিতান্তই পাথরের দেওয়াল আর টিনের চালের গাঁয়ের গুম্ফা। পাহাড়িরা এমনিতে বেঁটে, তায় ঝুঁকে চলে। তাই গুম্ফায় ঢোকার সময় মাথা হেঁট না করলে হাতে হাতে (অথবা মাথায় মাথায়) শাস্তি পাবে। এককাপ দিশি (এরা বলে 'রকশি') দিয়ে আপনাকে স্বাগত জানানো হবে, ব্যাপারটা এত সহজ স্বাভাবিক আপনার মনে হবে চরণামৃত খাচ্ছেন। সভ্যতার সতীপনা অরুণাচলে এখনো প্রচলিত নয়। তবে ওই এক কাপ, তার বেশি বাঙ্গালির পেটে সইবেনা।

গুম্ফার একচিলতে দালান পেরিয়ে গর্ভগৃহে ঢুকতেই একটা নাক সুড়সুড় করা, অল্প খানিকটা পচন ধরার গন্ধ। ইয়াকের মাংস দিয়ে তৈরি 'থুকপা' - মোমোর মতন, তবে মাখন দিয়ে ফেঁটানো। মাংসটা গতকালেরও হতে পারে, একমাস আগেরও হতে পারে। রোজ রোজ তো আর ইয়াক শিকার করা যায়না। আমোও খাই ঠাকুরও খান এই হল অরুণাচলের বৌদ্ধধর্ম। শাকাহারী, সে স্বয়ং শাক্যসিংহই হোন না কেন, অরুণাচলে জীবনধারণ করতে পারবেননা (পায়েসের সুবন্দোবস্ত নেই)। ভক্তিভরে অল্প অল্প করে নাকমুখ টিপে থুকপা প্রসাদ চালান করে দিন।

একটা পাঁচফুট ছাদের ঘর। চলতে ফিরতেই মাথা ঠেকে যাবে। তার মাঝে চৌকো করে পাতা একফুটের লম্বা লম্বা টেবিল, কোন একটা জন্তুর পশম দিয়ে পুরো ঘর আর টেবিল ঢাকা দেওয়া। তার পাশে ছোট বড় মাঝারি লামা আর গ্রামের লোকজন বসে। বিয়ার আর থুকপার মোচ্ছব। একটু মৌতাতের ব্যবস্থা না হলে

পরমেশ্বর আসরে আসবেন কেন? অতএব দুই 'ম' সহযোগে একরাতের উপগুপ্ত হয়ে বসুন।

এরা খুব সাদাসিধে লোক। সবচেয়ে সহজ সরল এদের নাম। 'পেমা', 'দোরজি' ও 'খান্ডু' এই তিনটে শব্দের পারমুটেশন করে এদের নাম তৈরি হয়। পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে 'পেমা খান্ডু' বলে হাঁক দিলেই পিলপিল করে যত পেমা খান্ডুর দল ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে। এদের মুখগুলো একরকম, নামগুলো এক, কিকরে যে এরা পরস্পরকে চেনে কে জানে।

এদের সারল্যর আরো প্রমাণ, অরুণাচলে ঢোকা ইস্তক কোন মদ্দ জোয়ানকে আমি কোন কাজ করতে দেখিনি। ধ্যানেশ্বর ব্যোমকেশ একেকজন, সারাদিন বকওয়াজ-বিড়ি-বিয়ার। সংসার শ্মশানের মাঝে শিবনেত্র হয়ে বসে আছে সব। যা কাজ করে সব মেয়েগুলো। রাস্তার পাথর ভাঙ্গা থেকে সিমেন্টের মশলা মাখা সমস্তই ভামিনীকরপরশে সম্পন্ন হচ্ছে, আর ছেলেগুলো সব রাস্তার পাশে শুয়ে বিড়ি ফুঁকছে, এ দৃশ্য অরুণাচলেই সম্ভব। ইয়াক আনি ইয়াক খাই, অতএব তাইরে নাইরে নাই।

উলূপী কোন দেশের? নৃসিংহবাবু ঠিকঠাক বলতে পারবেন। তবে পূর্ব অরুণাচল, বিশেষতঃ মগের মুল্লুকের সীমান্ত এলাকাকে 'নাগরাজ্য' বলা যেতেই পারে। চিত্রাঙ্গদা মণিপুর রাজকন্যা, তবে এখনকার আর তখনকার মণিপুর এক কিনা আমার জানা নেই। তবে তার শৌর্য্যবীর্যের যা বর্ণণা, তাতে অরুণাচলজাতা হতে বাধা নেই। দুর্গা হিমালয়দুহিতা, হয়তো অপেক্ষাকৃত প্রাচীন উত্তর হিমালয়সম্ভূতা। তবে পূর্ব হিমালয়ের এই মেয়েরা যে মহামায়ার সবংশ তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষতঃ যখন চাদ্দিকে বরফ, পিঠে ঝোলার ভিতর বাচ্চা নিয়ে মোটা জ্যাকেট, উলের টুপি আর গামবুট পরা মেয়েগুলোকে যখন পাথর ভাঙ্গতে দেখি, তখন যেন আরো আটটা এক্সট্রা হাত দেখতে পাই। ভাঙ্গছে পিষছে গড়ছে, হাঁপরের মত,

হাতুড়ির মত। মুহূর্মুহূ কত অসুর গুঁড়িয়ে চুরমার হচ্ছে। মাঝেমাঝে উলের টুপিটা খুলে হৈমবতী প্রকাশ হন। চামুন্ডা রূপ দেখিনি এখনো। তবে দুচারজন ধূমাবতীকে দেখেছি। বিড়ির লিঙ্গভেদ নেই কিনা।

সন্ধ্যা। অর্থাৎ কিনা বিকেল চারটে। পশ্চিমের পাহাড়ের পিছনে সূর্য্য ডুবতেই ঝুপুস অন্ধকার। এবার একটু প্রস্তর যুগ প্রস্তর যুগ খেলব। বিদ্যুত মোবাইল ফেসবুক কিছু নেই। প্রথম মানুষের মত অন্ধকারে বসে আছি। পনের মিনিট পর নতুন প্রস্তর যুগ আসবে, বুখারিতে আগুন জ্বলবে। চার পাঁচটা তাঁবুর মাঝে bonfire জ্বলবে। ওই এল বুঝি একখানা চিরুনদাঁতী বাঘ, বা একটা লোমশ ম্যামথ। আগুনের তেজ বাড়াও। বাতাসে ক্রিটেশিয়াস যুগের স্বেদ রক্ত মাখা আদিম গন্ধ। হয়তো আজই প্রথমবার নিহত প্রাণির রক্তে লাল হল জল। সময় ভুল হয়ে যায়। এই যে আপনি নকুড় বড়াল স্ট্রিটের ময়রার দোকানের দোতলার ভাড়াটে, হঠাৎ আবিষ্কার করলেন মাথার ওপর শুধু তারার চাঁদোয়া, পায়ের নিচে এলিফ্যান্ট ঘাসের জঙ্গল। ওকি ! আপনার হাতে ওটা কি? পাথরের মুগুর নাকি? বাঃ, তাতে অনেকগুলো কাঁটাও লাগিয়েছেন দেখছি। এটা কি পরেছেন? বেশ বড়সড় একটা ইয়াকের চামড়া দেখছি! আপনার প্লাস পাওয়ারের চশমাটা কোথায় গেল ? দূরে অন্ধকারে যে জোড়া জোড়া চোখগুলো জ্বলছে সেগুলো তো বেশ স্পষ্টই দেখছেন। পৃথিবীর প্রথম রণক্ষেত্রে হে অর্জুন ! উদ্ধারেদাত্মনাত্মানং ! আজ থেকে লক্ষ কোটি বছর পরে সিনোজোয়িক যুগের শেষে তোমার কোন নাম না জানা বংশধর এই অরুণাচলে ঠিক এইখানে বসে তাঁবুর ভিতর আগুন সেঁকবে। আকাশের তারাগুলো রইবে ঠিক এইরকম, এই পাথর গাছ মাটি ঘাস রয়ে যাবে সেই একই। সেই অচেনা অজানা বংশধর যাতে এই আকাশ দেখতে পায়, এই ঘাস শুঁকতে পায়, এই পৃথিবীর মায়া গায়ে মাখতে পায়, তারজন্য হে অর্জুন! অস্ত্র ধারণ করো !

চমক ভাঙ্গল খানসামার 'সাআআআব' শুনে। খাবার হাজির। কি হে, একখানা

বুনো শুয়োর রোস্ট করে আনলে নাকি। নেহি সাব, নিতান্ত দেশি মুরগি, তেজপুর থেকে সস্তায় কেনা। মুরগি হল খগমজাতীয়, avis শ্রেণিভুক্ত। তার পূর্বসুরী হল reptilia, অর্থাৎ টাইরানোসরাস, ভেলোসির‍্যাপ্টরের মত ভীষণকায় সব মেগা-সরীসৃপ – যারা এককালে এই পাহাড়ে শিকার করত। আমার প্র প্র প্র প্র ··· পিতামহ কোন এক লেমুর কোনো কায়দায় সেই ভয়াল দানবদের গ্রাস থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল বলে আমি, আজ এই চাঁদনি রাতে বসে সেই কুখ্যাত সরীসৃপ বংশোদ্ভব এই মুরগি উদরস্থ করছি। হে স্তন্যপায়ীকুলপ্রদীপ, হে কন্দরবিহারী মূষিকাগ্রজ, হে অজ্ঞাতকুলশীল লেমুর-পিতামহ, আমার প্রণাম গ্রহণ করো।

কলকাত্তাইয়া চোখে অরুণাচলের আকাশ দেখলে মনে হয় যেন অন্য গ্রহে এসে পড়েছি। একবার শুধু উর্ধ্বনেত্র হয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেই দৃষ্টি চলে যাবে এই ছায়াপথ ছাড়িয়ে মহাবিশ্বের কোন না জানা সীমায়। ইনকারা বলত, রাত হলেই দেবতারা আকাশে কালো চাদর বিছিয়ে দেন, সূর্য্য তাতে ঢেকে যায়। কিন্তু বহুকাল একই চাদর বিছাতে বিছাতে তাতে হাজার জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে, যার মধ্যে দিয়ে মিটমিট করে আলো ঢুকে পড়ে। ঘাসের ওপর শুয়ে ওই হাজার হাজার ফুটোগুলোকে দেখছি। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর যে অনুভূতিটা হয় তাকে কি নাম দেব জানিনা, গ্রীকরা বলত levitation, অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত যদি কিছু থাকে। হয়তো আছে, কে বলতে পারে। আমি যে নেহাৎ ক্ষুৎপিপাসাতুর অন্নময় সত্তা নই, ওই নক্ষত্রের খন্ড খন্ড জুড়ে আমি তৈরি, আমার প্রতিটি পরমাণু যে এই মহাবিশ্বের মতই সনাতন, এই কথাটুকু মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই বোধহয় প্রকৃতি অরুণাচলের সৃষ্টি করেছেন।

কখন ঘুমিয়ে গেছি। তাঁবুর দরজার ফাঁক দিয়ে ভোরের সূর্য্য চোখে লাগল। এবার যাব। অরুণাচল পেরিয়ে আরো পূবে, আরো পূর্বে।

সুভাষ হাট, অরুণাচল, ২০১৪

সাহারায় শিহরণ

সব ক্লাসেই বখাটে ছেলেপিলে থাকে। প্রখর রুদ্রকে তারা 'পোকা' বলে ডাকে।
তা কলেজে উঠে ছেলেরা তো নতুন গোঁফে তা দেবেই।
এ যৌবনজলতরঙ্গে ড্যাম লাগাবে কে !
তাই প্রখর রুদ্র এ সবে গা করেননা।
আজ সকালে যখন ক্লাসে ঢুকলেন তখন সামনের বেঞ্চের ফাজিল মেয়েগুলো ফ্যাক ফ্যাক করে হেসে উঠল।
তা এতে আর আশ্চর্যের কি !
তাছাড়া প্রখর রুদ্রের পাঁচ ফুট দেড় ইঞ্চির প্রস্থপ্রধান বপু, 'U' আকারের টাক আর ঝুনো গোঁফ দেখে হাস্যোদ্রেক না হওয়াই স্বাভাবিক।
তা হাসল তো প্রখর রুদ্রের বয়েই গেল। তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে খস খস করে লিখলেন - "নিৎশে"।
জানলার কার্নিশে একটা পায়রা এসে বসল।
"ভারতীয় দর্শনে যা চার্বাক, ইউরোপে তাই নিৎশে" - প্রখর রুদ্র ক্লাস শুরু করলেন। বেশিরভাগ ছাত্রই ডেস্কে হেলান দিয়ে ঘুমোতে লাগল। দুচারজন হোয়াটসঅ্যাপে ব্যস্ত রইল। কিছু লোন পেয়ার কুজনে মত্ত রইল। দাদুরী ডাকিছে সঘনে।
দর্শন।
গ্রীষ্ম।
প্রখর রুদ্র।
যাকে বলে হোলি ট্রিনিটি। খানিকক্ষণ বাদে একজন চেয়ার থেকে গড়িয়ে মাটিতেই পড়ে গেল।

কিন্তু পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা যুগযুগ ধাবিত যাত্রী। প্রখর রুদ্র ভ্রূক্ষেপ করলেননা।

নিৎশে তখন সবে বিসমার্ককে তুলোধোনা শুরু করেছেন। হঠাৎ ক্লাসরুমের কোণা থেকে একটা টিকটিকির শব্দ এল।

ঠিক, ঠিক, ঠিক।

প্রখর রুদ্র থামলেন।

টিকটিকি আরো একবার ডেকে উঠল, ঠিক ঠিক ঠিক।

দৃশ্যতই বিরক্ত প্রখর রুদ্র কোন কথা না বাড়িয়ে ঝড়ের মতই ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তার অনুপস্থিতি টের পেতে অবশ্য ছাত্রদের খানিকক্ষণ সময় লাগল।

অর্থাৎ অ্যানেস্থেশিয়া থেকে ফিরতে যত সময় লাগে।

প্রখর রুদ্র ততক্ষণে নিজের অফিসে পৌঁছে গেছেন।

"কি শুরু করেছ বলতো! কতবার বলেছি ক্লাসের মাঝে ডিস্টার্ব করবে না!"

জানলার পর্দার আড়াল থেকে অন্তরা বেরিয়ে এল - "রাখুন আপনার ক্লাস। যত সব গুলগল্প! দর্শন! ওদিকে কি কান্ড হয়ে গেল টেরও পাননা।"

প্রখর রুদ্র চেয়ারে আরাম করে বসে গড়গড়ায় একটা টান দিয়ে বললেন - "আমার কথা শুনে একটু চলার চেষ্টা করো। তোমার এই আধামিলিটারি পোশাকটা এখানে পরে না এলেই কি নয়! আমাকেও তো সবদিক বাঁচিয়ে চলতে হয়। স্পাই ঘুরছে চারিদিকে।"

অন্তরা নিজের ধূলিধূসরিতে সাতপুরনো জ্যাকেটটার দিকে তাকাল। তারপর বলল - "আপনি কি জেনেশুনে ইয়ার্কি করছেন? আপনার তো বেশ উন্নতি হয়েছে বলতে হয়!"

"আহা নাহয় একটা চুরিই হয়ে গেছে, এত উতলা হওয়ার কি আছে?" - প্রখর রুদ্র

গড়গড়ার জলে বুড়বুড়ি কাটতে লাগলেন। গড়গড়াটা কাঁচের, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের কিউরিও থেকে গত সপ্তাহেই কেনা।

অন্তরা এবার প্রখর রুদ্রের সামনের চেয়ারে বসে বলল - "তাহলে কি চুরি গেছে সেটাও জানেন নিশ্চয়ই।"

"অমর কারা বলোতো?"

এজাতীয় প্রশ্নে অন্তরার অভ্যাস হয়ে গেছে। ভ্রুক্ষেপমাত্র না করেই অন্তরা বলল - "আচ্ছা তাহলে আমার মুখ থেকেই শুনে নিন। খাফরার পিরামিড চুরি গেছে। একটা আস্ত পিরামিড, বুঝলেন! গতকাল রাত থেকেই গায়েব। আর প্লিজ জলে ওই আওয়াজটা করা বন্ধ করুন!"

"বিভীষণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, পরশুরাম, বলি ··· আর একটা যেন কে" - প্রখর রুদ্র চোখ বন্ধ করে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন- "জয় বজরংবলী!"

অন্তরা এবার একলাফে প্রখর রুদ্রের টেবিলের ওপর উঠে পাঞ্জাবির কলার টেনে ধরল - "শুনুন মশাই! আপনার নখরা বহু সহ্য করেছি! নেহাৎ মিশন পাঠিয়েছে বলে আপনার কাছে এসছি। কিন্তু আর নয়! এবার ফিরে গিয়েই আপনার ডি-ইন্ডাকশনের জন্য রেকমেন্ড করে চিঠি দেব। পাগল ছাগল লোক দিয়ে আমাদের এজেন্সি চলেনা!" - অন্তরার অন্তর থেকেই কথাগুলো বেরিয়ে আসে।

"করো কি! করো কি!" - প্রখর রুদ্রের আর্তনাদ - "বুড়ো বয়সে হার্টফেল করব। ছাড়ো বলছি!"- প্রখর রুদ্র ছটফট করতে থাকেন। কিন্তু অন্তরার মুষ্টি থেকে পাঞ্জাবিটা ছাড়িয়ে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়না।

"আজ রাত নটায় ফ্লাইট" - অন্তরা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল - "এক মিনিট এদিক ওদিক হলে ..." - পাঞ্জাবি ছেড়ে দিতেই প্রখর রুদ্র হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন - "কিন্তু আমার যে অ্যানুয়াল লিভ ক্যাজুয়াল লিভ সব শেষ। কলেজ আর ছুটি দেবে ভেবেছ!"

“মেডিকাল লিভ নিয়ে নিন, আমি প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছি যে আপনি যাকে তাকে কামড়ে দিচ্ছেন, ইমিডিয়েট হসপিটালাইজেশন ”।
প্রখর রুদ্র ততক্ষণে দম নিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছেন। পূর্ববৎ।
অন্তরা ভারী বুট গটগটিয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রখর রুদ্র চললেন।
অর্থাৎ তিনটে তোরঙ্গ, দুটো হোল্ডঅল, একটা ভাঁজ করা বালিশ তোষক মশারি, একটা জলের ফ্লাস্ক, একটা খাবারের প্যাকেট, একটা তারকেশ্বরের পুজোর চাঙ্গারি, এবং এ সবের পিছনে প্রখর রুদ্র ধুতি ফটফটিয়ে পাম্প শু মশমশিয়ে একটা পানের বাটা হাতে চললেন।
এয়ারপোর্টে এসমস্ত চেক ইন করাতে অন্তরার দেড় ঘন্টা খরচ হল। প্রখর রুদ্র ততক্ষণ বসে বসে খাবারের প্যাকেট খুলে আটটা লুচি আর আলুর দম সাঁটালেন।
“আপনি তদন্তে বেরিয়েছেন না তীর্থ করতে লছমনঝুলা যাচ্ছেন !” - ক্লান্ত অন্তরা পাশে এসে বসল। প্রখর রুদ্র প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন - “আহা, কখন কোন জিনিসটা কাজে লেগে যায়। খেয়ে নাও, কখন থেকে খাটছ।” যেন কত মায়া, প্রখর রুদ্রের আওয়াজে স্নেহ গলে গলে পড়ছে। অন্তরা লুচিগুলোর দিকে তাকিয়ে একটা মুখব্যাদান করল মাত্র।
তের নম্বর গেটে কিনশাসার ফ্লাইট। গেটে ঢোকার মুখে প্রখর রুদ্র এক কান্ড করলেন।
অর্থাৎ সামনে এক বাদামী স্যুট পরা বিদেশিকে জিজ্ঞেস করলেন - “ইয়ে, দাদা আপনি কি স্পাই ?”
আগন্তক প্রশ্নটা শুনে এতটাই হকচকিয়ে গেল যে খানিকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলনা। ততক্ষণে অন্তরা আগন্তুকের দুহাত পিছমোড়া করে চেপে ধরেছে।

কিন্তু তখনই প্রখর রুদ্র একটা চুক চুক শব্দ করে বললেন - "নাঃ, স্পাই নয় বোধহয়। ভুল হয়ে গেল। সরি স্যার।" এই বলে এগিয়ে গেলেন।

"আপনি কি ব্যাপারটাকে খেলা খেলা ভাবছেন ?" - অন্তরার ক্রুদ্ধস্বর। প্রখর রুদ্র ততক্ষণে নিজের সিট দখল করেছেন। "যাকেতাকে ধরে জিজ্ঞেস করবেন'আপনি কি স্পাই'?"

"আহা, রাগ করে না। এই নাও, একটা বাতাসা খাও।" প্রখর রুদ্র তারকেশ্বরের চাঙ্গারি খুললেন।

পাইলটের ঘোষণা, বিমানসেবিকাদের সতর্কতার পাঠ ইত্যাদি শেষ হওয়ার পরে যথারীতি প্লেন উড়ল।

আধঘন্টা হয়েছে। হঠাৎ প্রখর রুদ্র হাত তুলে বললেন - "এক্সকিউজ মি !"

বিমানসেবিকা এগিয়ে এল। প্রখর রুদ্র বিগলিত মুখ করে বললেন - "আমার পানের বাটাটা ওপরের তাক থেকে যদি দয়া করে নামিয়ে দেন।"

বিমানসেবিকা পানের বাটা চিনতে খানিক সময় লাগাল, কিন্তু খানিকক্ষণের মধ্যেই সেটা প্রখর রুদ্রের হাতে এল। প্রখর রুদ্র পান সাজতে বসলেন।

"আপনাকে এখনই পান খেতে হবে?" - অন্তরা ফিসফিস করে গজরাল।

"এই একটু পানদোষ আছে আমার" - প্রখর রুদ্র পানটা মুখে পুরে দিয়ে বললেন - "খাবে নাকি একটা? তাহলে বানাই। কাশীর জর্দা, বুঝলে তো!" আরামে প্রখর রুদ্রের চোখ বুজে আসে।

আইলের ওপারের সিট থেকে একটা লোক বারবার ম্যাগাজিনের থেকে চোখ তুলে এদিকে তাকাচ্ছে। বেশ খানিকক্ষণ লক্ষ্য করার পর অন্তরা প্রখর রুদ্রকে একটা খোঁচা দিল।

"আরে ধুর" - প্রখর রুদ্র উড়িয়ে দিলেন - "স্পাইফাই কিছু নয়, ও তোমায় দেখছে।"

“আচ্ছা আপনাকে কেন সাথে করে নিয়ে এলাম বলুন তো? আপনি কি সত্যিই গোয়েন্দা? আজ অব্দি তো কোনও নজির পেলামনা । স্পাই দেখে চিনতে পারেননা, আপনি কি মশাই !”

প্রখর রুদ্র কোন উত্তর না করে হাতে করে যে 'সানন্দা' -টা এনেছিলেন তাতে মন দিলেন । খানিকক্ষণ পরে অন্তরাকে দেখিয়ে বললেন - “এই পর্দার ডিজাইনটা আমার অফিসে লাগাব । ভালই লাগবে, কি বলো !”

অন্তরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ।

প্লেন মাসকাট ল্যান্ড করল । এবার আধাঘন্টার বিরতি । অন্তরা যাকে স্পাই ভাবছিল সে লোকটা নেমে গেল । একদল নতুন লোক প্লেনে উঠল । পাইলট আর বিমানসেবিকার দলও বদলে গেল ।

প্লেন আবার আকাশে উঠল ।

“দেখছেন, ওর ভাবভঙ্গি কেমন যেন” - অন্তরা ফিসফিস এক নতুন পাইলটকে দেখাল ।

প্রখর রুদ্র এবার সিটবেল্ট খুলে বিমানের সামনের দিকে গিয়ে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বলতে শুরু করলেন - “ভদ্রমহোদয়গণ ! আপনাদের মধ্যে গুপ্তচর কেউ থাকলে স্বচ্ছন্দে জানাতে পারেন । আমি আপনাদের সমস্ত তথ্য সহকারে সহযোগিতায় রাজি । যদি কেউ আমাকে অপহরণ অথবা গুমখুন করার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে আমি আশ্বস্ত করছি, তার কোনও প্রয়োজনই হবেনা ।”

যাত্রীদের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন ছাড়া অন্য কোন প্রতিক্রিয়া হলনা । এক বিমানসেবিকা প্রখর রুদ্রকে সিটে বসিয়ে দিয়ে গেল ।

“একবারে পরিষ্কার কথা বলে নেওয়াই ভাল, তাই না !” - প্রখর রুদ্র যেন বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন ।

অন্তরা মাথায় হাত চেপে বসে আছে ।

প্লেন কিনশাসায় নামল। এক শ্বেতাঙ্গ আপাদমস্তক মিলিটারি ইউনিফর্মে লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্তরা তার সাথে হ্যান্ডশেক করল।

"মেজর হিলবার্ট ক্রেন" - অন্তরা পরিচয় করিয়ে দেয় - "আর ইনি প্রখ্যাত প্রখর রুদ্র। মেজর হিলবার্ট এই মিশন ডাইরেক্টর।"

"গ্ল্যাড টু ফাইনালি মিট ইউ মিস্টার রুদ্র। আমাদের এজেন্সিতে আপনি একজন লেজেন্ডারি ফিগার!"

প্রখর রুদ্র যেন বিনয়ে মাটিতে মিশে গেলেন - "এ হেঁ হেঁ - আমি আর এমন কি - হেঁ হেঁ।"

দেঁতো হাসিটা দেখে অন্তরার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল।

"বাইরে কনভয় ওয়েট করছে" - হিলবার্টের প্রশ্ন - "বাই দা ওয়ে, আপনারা লাগেজ কালেক্ট করেছেন?"

কনভেয়র বেল্ট থেকে সমস্ত মালপত্তর যোগাড় করতে আরো আধঘন্টা গেল। হিলবার্ট ততক্ষণে হেদিয়ে পড়েছে।

"ইয়ে মানে আমার লাগেজ একটু বেশি" - প্রখর রুদ্র যেন ক্ষমাপ্রার্থী।

কনভয় বলতে একটা পাইলট কার, একটা ল্যান্ডরোভার, আর পিছনে একটা ট্রাক। ট্রাকের মধ্যে মালপত্র তুলে তিনজন ল্যান্ডরোভারে বসলেন। ধুলো উড়িয়ে কনভয় চলল উত্তরে।

প্রখর রুদ্র অন্তরাকে খোঁচা দিয়ে বললেন - "ষন্ডাটাকে জিজ্ঞেস করো না, কোথায় যাচ্ছি?"

"জিজ্ঞেস করার কি আছে? সাউথ সুদান আর ইজিপ্টের বর্ডারে বেসক্যাম্প। আজকের মত সেখানেই ব্যবস্থা।"

"হুঁ" - প্রখর রুদ্র শঙ্কিত - "সেটা কি সাহারার মধ্যেই কোথাও?"

"কেন, ভয় করছে নাকি?" - অন্তরার খোঁচা।

বিকেল হয়ে এসেছে। কাঁচা রাস্তা, ধুলো, চারপাশে কালো কালো বাচ্চা গাড়ির পিছন পিছন ছুটে চলেছে। প্রচুর জঙ্গির আস্তানা সাউথ সুদান। গাড়ির কাঁচের ওপর লোহার জাল লাগানো।

"মিস্টার রুদ্র, এই গোটা ব্যাপারটা নিয়ে আমি আপনাকে ব্রিফ করে দিতে চাই " - হিলবার্ট মুখ খুলল। প্রখর রুদ্র অত্যন্ত কৌতূহল ভরে তাকালেন।

"গত পরশু রাত আড়াইটের সময় একটা লোকাল ছেলে খেয়াল করে যে খাফরার পিরামিড নেই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, খাফরার পিরামিডটাই সবচেয়ে বড় এবং প্রধান। তার পর থেকে সারা পৃথিবীর মিডিয়ায় এ নিয়ে হইচই পড়ে গেছে। বিষয়টা যেহেতু আন্তর্জাতিক, তাই ইউনাইটেড নেশনস তৎক্ষণাৎ আমাদের এজেন্সিকেই এ কাজে ডিটেল করে। তারপর থেকে গত আটচল্লিশ ঘন্টা ধরে জায়গাটা আমরা চিরুনি তল্লাশি করে ফেলেছি, পৃথিবীর সমস্ত এয়ার, রেল এবং রোড ট্রাফিক মনিটর করেছি, প্রায় সমস্ত দেশের সিকিওরিটি সিস্টেম হ্যাক করে ফেলেছি, স্যাটেলাইট ইমেজ থেকে সারা পৃথিবীর সারফেস তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। পিরামিডের মত একটা বস্তু যে গায়েব হয়ে যেতে পারে এ আমাদের ধারণার..."

হিলবার্টের কথা শেষ হলনা, একটা বিরাট পাথর গড়িয়ে পড়ে ল্যান্ডরোভারটাকে কাত করে দিল। প্রখর রুদ্র টাল সামলাতে পারলেননা, আছড়ে জানলার কাঁচের ওপর পড়লেন। হিলবার্ট পিছনের দরজার ওপর ছিটকে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল, শুধু অন্তরা কোনরকমে একটা হাতল ধরে সোজা রইল।

পাইলট কার থেকে বারো তেরোজন ততক্ষণে কার্বাইন হাতে বেরিয়ে পড়েছে। পাইলট কারের মাথায় একট এল এম জি ফিট করা, তাতেও লোক মজুত।

"চুপ, যেভাবে আছেন ওভাবে পড়ে থাকুন" - অন্তরা সিটের পিছন থেকে এ কে ফিফটি থ্রি টা তুলে নিতে নিতে বলল - "একদম নড়াচড়া নয়। আমি এক মিনিট আসছি।" এই বলে দরজা খুলে(অর্থাৎ উপরদিকে খুলে) বেরিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর কয়েকটা গুলির বার্স্ট, হঠাৎ প্রখর রুদ্র দেখলেন, একটা প্রচন্ড বিস্ফোরণে সামনের পাইলট কারটাই উড়ে গেল। সামনে গার্ডের দল ছত্রভঙ্গ, আরো কয়েকটা বার্স্ট, তারপর আবার চুপচাপ।

"জলদি বেরিয়ে আসুন," - অন্তরার গলা - "ওরা এল বলে", অন্তরা দরজার বাইরে থেকে হাত বাড়াল।

প্রখর রুদ্র ধুতির কোঁচা বাঁধতে বাঁধতে বললেন - "আমার একটু সময় লাগবে, তুমি পালাও।"

"উঃ কি জ্বালা, এখন আপনার ধুতি ..."

প্রখর রুদ্র অন্তরার মুখের খুব কাছে গিয়ে বললেন - "যা বলছি করো, খার্টুমের বাজারে মুস্তাফির তরমুজের দোকানে চলে যাবে। এখন যাও। যাও!"

প্রখর রুদ্রের গলায় এমন একটা দার্ঢ্য ছিল যে অন্তরা অমান্য করতে পারলনা।

অন্তরা চলে যাওয়ার আধা মিনিটের মধ্যে ওদের দলটা গাড়ি ঘিরে ফেলল।

একটা খুপচি কেবিন। টিমটিম করে একটা সিএফএল বাল্ব জ্বলছে। বোঁটকা গন্ধে ঘরটা ছেয়ে আছে। প্রখর রুদ্র চেয়ারের হাতলে বাঁধা। চোখ বন্ধ করে একদম টানটান হয়ে সিধা বসে আছেন। মাঝে মাঝেই নাকমুখ কুঁচকে জোরে জোরে শ্বাসের শব্দ করছেন। তিনজন মুশকো পাহারা দিচ্ছে।

রাইকারস্টাফ ঘরে ঢুকতেই দৃশ্যটা দেখে থমকে গেলেন।

"এ আবার কি নতুন নকশা শুরু করলেন?"

প্রখর রুদ্র চোখ খুলে বললেন - "এই একটু কপালভাতি করে নিচ্ছি। ভাবছি এখন থেকে রেগুলার যোগাসন করব। বয়স হয়ে গেল তো!"

"এখন আপনার যোগাসনের সময়!" - রাইকারস্টাফ বিরক্ত - "আপনাকে এখন জেরা করব, টর্চার করব, আর আপনি সেসবে মন না দিয়ে যোগাসন করছেন!"

“ওরে বাবা” - প্রখর রুদ্র ভীত - “মারবে নাকি? আমার আবার একটু এক্সাইটমেন্ট হলেই হাঁপানির টান ওঠে। উত্তেজনাটা একদম নিতে পারিনা। ইনহেলার রেডি আছে তো? নাহলে আমার ব্যাগের সাইড পকেট থেকে বার করে রাখো বাবা !”

রাইকারস্টাফ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে প্রখর রুদ্রের সামনে বসলেন। “আপনাকে তো আজ থেকে চিনিনা, সেই হন্ডুরাসে দেখা। কি প্ল্যান ভাঁজছেন ঝেড়ে কাশুন না ! আপনি কি সত্যিই মনে করেন এই বারও পার পেয়ে যাবেন ? আপনারও বয়স হয়েছে, ভীমরতি বলে একটা ব্যাপার আছে স্বীকার করেন তো? নইলে আপনি যে কান্ডকারখানা শুরু করেছেন, আপনার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরাও খুব ভাবিত।”

“এই দেখো কান্ড। আমি কি বলেছি আমি পার পেয়ে যাব ? তোমাদের হাত থেকে পার পাওয়া কি সোজা কথা? ছি ছি ছি ছি, অমন কথা আমি মনেও আনিনা।”

“তার মানে আপনি স্বীকার করছেন কাজটা আপনিই করেছেন।”

প্রখর রুদ্র একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন - “আহা আমি কি তাই বললাম নাকি ? দেখো ভায়া, তুমি বাপু কান্ট হেগেলের দেশের লোক, পাত্রাধার তৈল আর তৈলাধার পাত্রের তফাৎ করতে পারোনা, নিজেকে জার্মান বলো কোন আক্কেলে?”

রাইকারস্টাফ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন - “হুঁ, শখের প্রাণ, ! প্রাণের ভয় আপনার নেই জানি, তার কারণ কতদিনই বা আর বাঁচবেন ! তিনকুলে কেউ নেই, আপনাকে যে কি দিয়ে ভয় পাওয়ানো যায় তাই ভাবছি !”

“আমি এমনিতেই খুব ভিতু” - প্রখর রুদ্র বাঁ নাসারন্ধ্র দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বললেন - “একটা আরশোলা গায়ে ছেড়ে দিলেই ভয় পেয়ে যাব !”

“আরশোলা!” - রাইকারস্টাফ একটু ভেবে নিলেন - “আরশোলা তো হাতের কাছে নেই, সাহারার তেঁতুলবিছে আছে কয়েকটা। চলবে নাকি?”

“তেঁতুলবিছে ! না না, ও বড় খারাপ। হুল ফোটালেই অক্কা। আমাকে ভয়

পাওয়ানো নিয়ে তো দরকার, একেবারে মরেই গেলে কোন কাজে লাগব ! আচ্ছা আরশোলা না হয়, ধেড়ে ইঁদুরটিদুরও যদি পাওয়া যায় ! খুঁজেপেতে দেখোই না !”

“আমি বরং একটা সুপ্রস্তাব করছি” - রাইকারস্টাফ আশান্বিত মুখ করে বললেন - “আপনি যদি ভাল মুখ করে বলে দেন পিরামিডটা কোথায় রেখেছেন তাহলেই আর এত হ্যাঙ্গাম করতে হয়না।”

“এই কথা মাত্র !” - প্রখর রুদ্র ব্যাজার মুখ করলেন - “এতো আমি ভয় না পেলেও বলে দেব। এর মধ্যে এত ঢাক ঢাক গুড় গুড় কিসের ! সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে বোমাবাজি করলে ছোঁড়া ! গাড়ি থামিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলেই হত।”

“কি করব বলুন!” - রাইকারস্টাফ বিষণ্ন - “আপনার অ্যাসিস্টান্ট ! ভায়োলেন্সের ভায়োলিন একটা। ঝাড়পিট ছাড়া কিছু বোঝেনা। তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে আমার বারোটা লোককে ঘায়েল করেছে !”

“ও যেন কিরকম” - প্রখর রুদ্র কাঁচুমাঁচু হয়ে বললেন - “ছোটবেলা থেকে দেখছি তো, মারকুটে ভাবটা আর গেলনা। ”

“যাকগে, যা গেছে তো গেছে। এবার চট করে পিরামিডটা কোথায় বলে দিন তো। অনেক রাত হল।”

“বটেই তো, বটেই তো, , আমার আবার খাওয়াদাওয়ার অনিয়মটা একদম সয়না । খাওয়ার জন্যই তো বাঁচা। তা রাতের মেনুটা কি ? আমার আবার একটু শেষপাতে দই না থাকলে সকালে বড় প্রবলেম হয় !”

“হুঁ, সে না হয় কোন একটা ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু কাজের কথাটা হয়ে যাক আগে। পিরামিডটা কোথায় রেখেছেন যদি এইবার বলে দেন, তাহলে আমায় আর অভদ্রতাগুলো করতে হয়না। নইলে আবার সেই মারপিট, রক্তারক্তি, কাটাকাটি - আর ভাল্লাগেনা।”

“সে আর বলতে” - প্রখর রুদ্র একটা চুক চুক শব্দ করলেন - “আসলে কি হয়েছে

জানো, কথাটা আমার গলায় এসে আটকে রয়েছে, বলব বলব করছি, কিন্তু মুখে আসছেনা। আলজিভে আটকে রয়েছে।”

“কেন?” - রাইকারস্টাফ কৌতূহলী।

“মানে,” প্রখর রুদ্র গলা খাঁকরে বললেন - “আমি একজনকেই ভয় খাই। আর সে এই এল বলে। সে যদি জানতে পারে আমি পিরামিড কোথায় তোমাদের বলে দিয়েছি, তাহলে রেগেমেগে একটা যা তা কান্ড করে ফেলবে। চাই কি আমাকেই এনকাউন্টার করে দিল হয়তো!”

“কে? কাকে ভয়?” - রাইকারস্টাফ সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকালেন।

প্রখর রুদ্র রাইকারস্টাফের খুব কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন - “আমার অ্যাসিস্টান্ট।”

প্রখর রুদ্রের কথা শেষ হলনা, একটা ঝটিতি গুলির বার্স্ট ঘরের এদিক থেকে ওদিক বয়ে গেল। রাইকারস্টাফ কোনরকমে টেবিলের নিচে ঝাঁপ দিয়ে মাথা বাঁচালেন। ঘরের মধ্যে পনের সেকেন্ডের মধ্যে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল।

“কেমন কাটল তিন ঘন্টা? গুঁতো খেলেন কিছু?” - দড়ি খুলতে খুলতে অন্তরার প্রশ্ন।

“ওই আরকি, একটু যোগাসন করছিলাম।” - প্রখর রুদ্র উড়নিটা গায়ে চাপিয়ে টেবিলের নিচে ঝুঁকে রাইকারস্টাফকে বললেন - “ইয়ে, মানে খুব ঘেমে গেছি, একটু আতর পাওয়া যাবে কোথাও?”

অন্তরা টেবিলের নিচ থেকে রাইকারস্টাফকে হিঁচড়ে বার করল - “এটাই কি পালের গোদা নাকি? তাহলে আমাদের এ-ই বাইরে নিয়ে যাবে।”

“আহা, লক্ষ্মীটি আমার, ওরকম জোর করে চেপে ধরতে নেই, ভদ্রলোকের হাঁতদুটো বেঁধে গলায় বন্দুক ঠেকিয়ে নিয়ে গেলেই হবে।” - প্রখর রুদ্রের পরামর্শ।

প্রখর রুদ্র চললেন। সামনে রাইকারস্টাফের গলায় বন্দুক ঠেকিয়ে অন্তরা। তিনটে দরজা, দুটো সুড়ঙ্গ আর ষোল সতেরজন রক্ষী পেরিয়ে গুহার মুখের কাছে পৌঁছনো গেল।
সামনে সাহারা।

"আপনি করে দেখালেন মশাই" - ক্লান্ত অন্তরার স্বীকারোক্তি - "কোন প্ল্যান ছাড়া এইভাবে যে আপনি আমাকে নিয়ে চরতে বেরোবেন ভাবতেই পারিনি!"
চারঘন্টা ধরে সাহারায় পদচারণা করছেন তিনজন। মাথার উপর তারায় ছাওয়া রাত, নিচে খালি ঠান্ডা বালি। দিগদিগন্তের ঠিক নেই। হাড় হিম করা সাহারার বাতাস।
"মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা" - প্রখর রুদ্র গুনগুন করছেন - "কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা !"
"কিন্তু মনে মনে !" - অন্তরা ফুট কাটল।
"ইয়ে, আপনার মনে কি একবারও আসছেনা যে এখানেই আমাদের সমাধি হতে পারে?" - রাইকারস্টাফের প্রশ্ন।
"আহা, ব্যাপারটাকে ওভাবে ভাবছ কেন?" - প্রখর রুদ্র উদাত্ত স্বরে আবৃত্তি শুরু করলেন - "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন, পায়ের তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন ! মনে করো না, আমরা একটা বিশাল বিচ-এ এসেছি !"
"খালি সমুদ্রটা নেই" - অন্তরার আক্ষেপ।
রাইকারস্টাফ ধৈর্য্য হারালেন - "আমি আর খেলব না ! পা টনটন করছে। চোখে বালি নাকে বালি। কোথায় যাচ্ছি জানিনা। আমি এই বসলাম।" - রাইকারস্টাফ ধপ করে বসেই পড়লেন।"
অন্তরাও তার পাশে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল - "মরতে হয়ে এখানেই মরব। রাইট

অ্যাট দিস স্পট। আর ঘুরতে পারছিনা।”

প্রখর রুদ্র তখন ধুতি আর পাম্প শু থেকে ঝেড়ে ঝেড়ে বালি সাফ করছেন।

“লোকটাকে দেখে তোমার মনে কি কখনো একটুও সন্দেহ জাগেনি ?” রাইকারস্টাফ অন্তরাকে ফিসফিস করে প্রশ্ন করলেন।

“কি?” - অন্তরা ঘুরে তাকাল।

“যে লোকটা বোকা হওয়ার ভান করছেনা, সত্যিই বোকারাম।”

“হুঁ”, অন্তরার আক্ষেপ - “কথাটা মাঝেমাঝেই ভাবি। লোকটাকে যতটা বুদ্ধিমান ভাবি ততটা হয়তো নয়।”

“আমার তো সন্দেহ হয় ভুল লোককে উঠিয়েছি। পিরামিডটা আদপেই ওর কাছে নেই !” - রাইকারস্টাফের সন্দিগ্ধ স্বীকারোক্তি।

“ওর কাছে?” - অন্তরা ভুরু কুঁচকাল - “মানে? পিরামিড তো তোমরাই চুরি করেছ !”

“কচু! চুরি করতে পারলে তো ভালই হত। আমাদের আগেই বুড়ো তুলে নিয়ে গেছে।”

“হোয়াট !” - অন্তরা লাফিয়ে উঠল - “কি সর্বনাশ ! তুমি ঠিক জানো !”

“আর কে হতে পারে!” - রাইকারস্টাফের ক্ষোভ - “গটিংবার্গের কীর্তির কথা কটা লোক আর জানে !”

অন্তরা রাইকারস্টাফের গলায় বন্দুক ঠেকিয়ে বলল - “পুরো গল্পটা শুনতে চাই ! এখনই।”

“আরে ধুর, নিকুচি করেছে তোমার বন্দুকের !” - রাইকারস্টাফ বন্দুকটাকে হাত দিয়ে নামিয়ে দিলেন - “আর আধঘন্টার মধ্যে আমরা দুজনেই বালিয়াড়ি হয়ে যাব।”

অন্তরা দেখল, পায়ের ওপর বালি জমতে শুরু করেছে।

“হিটলারের মৃত্যুর পর আমাদের পুরো গোষ্ঠীটাই আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়। প্রায় দশ বছর লুকিয়ে লুকিয়ে থাকার পর আমাদের কাছে প্রথম ভাল খবর ছিল গটিংবার্গের আবিষ্কার।”

“গটিংবার্গ কে?”

“হারম্যান গটিংবার্গ ছিলেন লিপজিগ ইউনিভার্সিটির ফিজিক্সের প্রফেসর। উনিশশো সাতান্ন তিনি এমন একখানা কীর্তি করেন, যা কোন জার্নালে ছাপাতে তার সাহস হয়নি। কিন্তু আমাদের চর সর্বত্র। জার্মানিতে বসে আমাদের নজর এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব।”

“কীর্তি!” - অন্তরা ফিসফিসিয়ে বলল - “কি?”

“অ্যান্টিম্যাটার।”

“কি?”

“সেই উনিশশো সাতান্নতেই গটিংবার্গ পজিট্রনের এত বড় একটা ডিপোজিট বানিয়েছিলেন, যা একখানা আস্ত দেশ উড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।” - রাইকারস্টাফ থেমে থেমে বললেন - “কিন্তু গটিংবার্গকে বহু জেরার পরেও আমরা জানতে পারিনি, এই ডিপোজিট তিনি কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন।” রাইকারস্টাফের স্বর ভারি হয়ে গেল - “উনিশশো একষট্টি সালে আমাদের হেফাজতেই তার অত্যন্ত যন্ত্রণাকাতর মৃত্যু হয়। জার্মান প্রতিভার অপমৃত্যু।”

“এবং সেটা জানা গেল ...”

“এই তিনদিন আগে। গটিংবার্গের একটা ফোন কলের ট্রানস্ক্রিপ্ট থেকে। লিপজিগ এক্সচেঞ্জ খুঁড়ে বার করা। পজিট্রনের পুরো ডাব্বাটাই লুকানো ছিল...”

“খাফরার পিরামিডের ভিতর” - অন্তরার দীর্ঘশ্বাস।

“একটা গোপন কুঠুরিতে।” - রাইকারস্টাফ চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন - “পিরামিডের জন্য সার্চপার্টি অর্গানাইজ করলাম। গিয়ে দেখি গোটা পিরামিড ভ্যানিশ।”

“হুঁ” - অন্তরার মাথায় আস্তে আস্তে ব্যাপারটা খোলসা হচ্ছিল - “বিশল্যকরণীর বদলে হনুমানজী গন্ধমাদন উঠিয়ে এনেছেন। কিন্তু কিভাবে? আস্ত একটা পিরামিড !”

“কে জানে ! ওটা গ্রেনাখারের কাজ মনে হয়। ওর সাথে অনেক ইউনিভার্সিটির র‍্যাপো আছে। ”

“গ্রেনাখার কে?”

“গুপ্তচর। বহুদিন আমাদের দলে লুকিয়ে খবর পাচার করত। বুড়োর সাথে অনেকদিনের যোগাযোগ। ওকে দিয়েই কাজটা করিয়েছে বলে আমার ধারণা। একবার হাতে পেলে...”

বালির মধ্যে হঠাৎ একটা প্রবল আলোড়ন উঠল। অন্তরা মাথার ওপর তাকিয়ে দেখল একটা এ এল এইচ হেলিকপ্টারের মধ্যে থেকে হাত নাড়ছে একট বাদামী স্যুট পরা লোক।

যাকে প্রখর রুদ্র এয়ারপোর্টে স্পাই বলে প্রশ্ন করেছিলেন।

“ওই তো গ্রেনাখার” - রাইকারস্টাফ চেঁচিয়ে উঠলেন। হেলিকপ্টার ধীরে ধীরে মাটির কাছে আসতে থাকল। বালিতে চারদিক ছেয়ে গেল। অন্তরা আর রাইকারস্টাফ দুজনেই নাক মুখ চাপা দিলেন। প্রখর রুদ্র উড়নিটা নাকে চাপা দিয়ে দুজনকেই উঠে আসতে ইঙ্গিত করলেন।

প্রথমে উঠল অন্তরা, পিছন পিছন রাইকারস্টাফ। গ্রেনাখার আর রাইকারস্টাফের মধ্যে একটা ক্রূর দৃষ্টি বিনিময় হল ঠিকই, কিন্তু হাত বাঁধা থাকায় রাইকারস্টাফ বিশেষ কিছুই করতে পারলেননা।

হেলিকপ্টার উড়ে চলল।

“তাহলে পিরামিডটা আপাততঃ গ্রেনাখারের কাছেই?” - রাইকারস্টাফের প্রশ্ন।

“না” - প্রখর রুদ্রের সংক্ষিপ্ত জবাব।

“আপনার কাছে?”

“না।”

অন্তরা রাইকারস্টাফকে খোঁচা মেরে বলল - “একটু ড্রামা করতে উনি ভালবাসেন। শেষ সিনের আগে পর্দা উঠবেনা।”

“এখনো সিন বাকি!” - রাইকারস্টাফ প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

“কিন্তু একটা গোটা পিরামিড আপনি গাপ করলেন কিকরে বলুন তো?” - অন্তরার প্রশ্ন।

হেলিকপ্টার থেকে দূরে দেখা যাচ্ছে খুফুর পিরামিডের ছায়াটা হ্রস্ব থেকে হ্রস্বতর হচ্ছে। সাহারায় সূর্য উঠছে।

“পরমাণুর বেশিটাই ফাঁকা জায়গা জানেন তো?” - গ্রেনাখারই কথাটা তুলল - “অর্থাৎ প্রোটন ইলেকট্রনের যা সাইজ, তার তুলনায় তার তাদের মধ্যেকার দূরত্বটা বি-রা-ট !”

রাইকারস্টাফ বেশ মন দিয়ে শুনছেন।

“ঘুরিয়ে বলতে গেলে, যে কোন বস্তু যতটা জায়গা দখল করে থাকে, অর্থাৎ তার আয়তন, তার বেশিটাই হল ফাঁকা জায়গা।”

“এবং প্রখর রুদ্র সে জায়গাটা কমিয়ে যেকোন জিনিসকে মিনিয়েচারাইজ করার পদ্ধতি বার করেছেন !” - রাইকারস্টাফের বিস্ময়।

“নট ডক্টর রুদ্র। পন্ডিচেরির এক প্রফেসর। বাকি ডিটেল আপনাকে নাই বললাম। আপনাদের নজর তো ভাল নয়।”

হেলিকপ্টার খাফরার বাজারের থেকে খানিকটা দূরে ল্যান্ড করল। অন্তরা দুজনকে দেখতে পেল। প্রথমজন হিলবার্ট, সৈন্যসামন্ত নিয়ে দাঁড়িয়ে।

আর দ্বিতীয়জনকে কোথায় দেখেছে অন্তরা মনেই করতে পারলনা।

হেলিকপ্টার থেকে নামতেই রাইকারস্টাফ হিলবার্টের দলবলের হাতে বন্দি হল। প্রখর রুদ্র দ্বিতীয়জনের কাছে গিয়ে বললেন - "ইয়ে, এবার যেখানকার জিনিস সেখানে!"

অন্তরার এবার চেহারাটা মনে পড়ল। যে এয়ারহোস্টেস প্রখর রুদ্রকে প্লেনে পানের বাটা নামিয়ে দিয়েছিল।

এবং সেই পানের বাটাটাই এখন মেয়েটার ব্যাগ থেকে বেরল।

"সরি তোমাদের পরিচয় করে দেওয়া হয়নি। আফ্রিন ফিরাত, ইজরায়েল পুলিশ। রাইকারস্টাফের নিও নাৎসি গোষ্ঠীর পিছনে এরা বহুদিন থেকে ঘুরছে। আর এ হল আমার অ্যাসিস্টান্ট", বলে প্রখর রুদ্র একবার কেশে নিলেন - "অন্তরা। রাইকারস্টাফের পরিচয় দিতে হবেনা আশা করি।"

প্রখর রুদ্র এবার পানের বাটার ঢাকনাটা খুললেন। কয়েকটা পাতা, দুটো সুপুরি আর খয়েরের ডিব্বাটা সরাতেই সে জিনিসটা বেরল তার জন্য অন্তরা একেবারেই অপ্রস্তুত ছিল।

একটা ছোট্ট, আধা আঙ্গুল পরিমাণ পিরামিড। ছোট হলেও তার প্রতিটা খাঁজ, প্রতিটা পাথর যেন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

রাইকারস্টাফের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল - "এটাই..."

"খাফরার পিরামিড, হ্যাঁ" - প্রখর রুদ্র বোঝাতে বসলেন - "তবে তুমি যা খুঁজছ এতে আর নেই। কলকাতায় গ্রেনাখারের থেকে নিয়ে আমি আফ্রিনের হাত দিয়ে পন্ডিচেরি পাঠিয়ে দিই। পজিট্রনের ডিপোজিট এখন যেখানে থাকার কথা সেখানেই, অর্থাৎ এক বিশেষভাবে সুরক্ষিত ল্যাবরেটরিতে। আর পিরামিডটা" - প্রখর রুদ্র আরেকবার জিনিসটাকে চেয়ে দেখলেন - "এবার ফেরৎ দিতে হবে।"

"আপনি তাহলে এত কান্ড করে আফ্রিকা আসতে গেলেন কেন?" - অন্তরার শেষ প্রশ্ন - "কলকাতায় বসেই তো সব কাজ সেরে ফেলেছেন!"

“আহা, আমার টোপ দেখিয়ে খোকাকে পাওয়া গেল” - প্রখর রুদ্র রাইকারস্টাফের গাল টিপে দিলেন - “এ কি কম পাওয়া!”
রাইকারস্টাফ গুমরে গুমরে বলল - “আপনার অ্যাসিস্টান্ট ঠিক সময়ে না পৌঁছলে এতক্ষণে আপনি পঞ্চভুতে...”
“ওর শত দোষের মধ্যে একটাই তো গুণ” - প্রখর রুদ্র হাসলেন - “ও ঠিক সময়ে পৌঁছে যায়!”

পরেরদিন সকালে দেখা গেল, পিরামিড যেমনকে তেমন রয়েছে।
অন্তরা পরের অ্যাসাইনমেন্টে মধ্যপ্রাচ্যে।
রাইকারস্টাফ এক ইজরায়েলি জেলে দিন কাটাচ্ছে।
নিও নাৎসিদের দল আছে ঠিকই, তবে রাইকারস্টাফের জায়গা ভরতে তাদের সময় লাগবে বহুদিন।
পজিট্রনের ডিপোজিট সার্ন এর হস্তগত হয়েছে।
প্রখর রুদ্র বোর্ডে লিখলেন - “শোপেনয়াওয়ার।”
বাইরে একটা কোকিল ডাকতে গিয়েও চেপে গেল।

সেঙ্গে, অরুণাচল, ২০১৪

আমি আছি তাই

দর্শনের প্রথম এবং মূল সমস্যাটা নিয়েই আলোচনা হয় সবথেকে কম - "কোন কিছু আছে কেন?"

"কোন কিছু" বলতে এক্ষেত্রে বোঝাচ্ছে সবকিছুই, অর্থাৎ আমার পেন্সিল কাটার কল থেকে শুরু করে অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকা। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে, এ সব কিছুই থাকা বা না থাকার সম্ভাব্যতা সমান। তাহলে না থাকার বদলে এরা আছে কেন ?

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার নানা আজগুবির মধ্যে আমার ফেভারিট এই গল্পটা। একদিন ভদ্রলোক মাঠে খেলতে গিয়ে দেখলেন আর কেউ খেলতে আসেনি (এই টিউশনির যুগে ব্যাপারটা তেমন বিরল নয়)। এই অবস্থায় বাকি বাচ্চারা যা করে, অর্থাৎ একা একাই রেলিঙ্গের সাথে খেলতে বসে যায়, শ্রীকৃষ্ণ তা না করে মাঠেই রয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ পরে সুদামা এসে দেখলেন, ষাট সত্তর জন শ্রীকৃষ্ণ মাঠের মধ্যে মেলা বসিয়ে দিয়েছেন। সবাই হলুদ ধুতি, সবার মাথায় ময়ুর। আর অরিজিনাল এককোণে বসে বাঁশি বাজাচ্ছেন। সুদামা গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন - "এই হরিহরছত্রের মেলা বসিয়ে দিয়েছ কেন?"

কৃষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন - "এমন তো নয় যে প্রথমবার করেছি ! প্রথমবার যখন করেছিলাম তখন তো কিছু বলোনি ! আর আমার কিনা একটু খেলতে ইচ্ছা করলেই দোষ।"

ভাগবত কাব্য। কবির ব্যাখ্যা শুনতে যতই ভাল লাগুক, বিজ্ঞানীর মনকে শান্তি দিতে পারেনা। "আমার চেতনার রঙ এ পান্না হল সবুজ" না হয় বোঝা গেল, কিন্তু 'আমি', 'পান্না' ও 'সবুজ' ব্যাপারটা কি? নাকি একই জিনিসের নাম তিনবার বললাম ? এই মহাবিশ্ব কি হরে গড়ে একটাই গোদা জিনিস (সমসত্ত্ব) না নানারকম জিনিস

মিলেমিশে তৈরি ?

দর্শনের যেকোন সমস্যার মতই, এক্ষেত্রেও সমস্যা যে একটা আছে সেটা দেখতে পাওয়াই প্রথম সমস্যা। আমি যদি কারোকে জিজ্ঞাসা করি যে আমার যে দুটো কান তার কি প্রমাণ ! এর স্বাভাবিক উত্তর এই যে মশাই আপনার কানদুটো তো সহজেই দৃশ্যমান কিন্তু তাদের মাঝে কি তা নিয়ে প্রত্যব্যয় রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে আমার দুটো কান নয়, আমার এমন দুটো প্রত্যঙ্গ রয়েছে যাদের আমি 'কান' বলে ডাকি। কানের বদলে নাক, এমনকি নরুন বলে ডাকলেও আমার কান এর 'কানত্ব' কিছুই ঘুচতনা। বারতোলুচ্চি তখনো এমন সব ছবি বানাতেন যা দেখলে শুধু দেশিকান নয়, বিদেশী 'কান' (Cannes) ও গরম হয়ে উঠত।

অস্তিত্ববাদ (existentialism) এর মূল গাঁট এই জায়গাটাই। নেতি নেতি করে শঙ্কর ব্রহ্মান্ডটাকেই ছুঁড়ে ফেললেন, তাহলে 'ইতি' টা কি জিনিস? 'কিছু নেই' বলে চোখ বন্ধ করে বসে রইলেই কি জগৎটা উধাও হয়ে যায়?

অর্থাৎ বনের মধ্যে গাছ ভেঙ্গে পড়ল। আশেপাশে কেউ নেই। গাছটা কি আদৌ পড়েছে?

আধুনিক বিজ্ঞানের গাছ হল শ্রডিনজারের বেড়াল। বেড়াল কে বাক্সবন্দি করে রাখা হল। বাক্সের ভিতর একটা কৌটোয় ভীষণ সব তেজস্ক্রিয় জিনিসপত্র রাখা। সমস্যা হল এই, যে কখন তার থেকে গামা রশ্মি বেরোবে তার কোন নিয়ম নেই। অর্থাৎ

ইচ্ছে হল এক ধরণের পাগলা জগাই

হঠাৎ করে ফেলতে পারে যা খুশি তাই

তাহলে বাক্সটা না খোলা অব্দি বেড়ালটা কি জীবিত না মৃত ? প্রশ্নটা এই নয়, যে বাক্স খুলে কি দেখব। প্রশ্ন এই, যে বাক্স *বন্ধ* অবস্থায় বেড়ালটা কি ভূলোকে না দ্যুলোকে। শ্রডিনজারের উত্তর ছিল, যেহেতু ওই গামা রশ্মির খামখেয়ালের ব্যাপারটা একেবারেই সব নিয়মের বাইরে, তাই বেড়ালের বাঁচা মরার সম্ভাব্যতা

সমান সমান। বেড়াল *একইসাথে* জীবিত এবং মৃত।

'বিগ ব্যাং' এর আগে ব্রহ্মান্ড ছিল ওই বেড়ালের মত। অর্থাৎ ছিল কিনা আমরা জানিনা। অথবা ঘুরিয়ে বলা, থাকা বা না থাকার সম্ভাব্যতা সমান। বিগ ব্যাং এর পরে এমন কি ঘটল, যার ফলে যুগ যুগান্ত পরে একটা দ্বিপদ স্তন্যপায়ী মর্কটকুলোদ্ভব হঠাৎ লুঙ্গি ডান্স শুরু করে দিল?

লুঙ্গিটাই বা কোথা থেকে এল ?

গ্রীক দার্শনিক পারমিনিডিস হলে বলতেন – ওসব লুঙ্গিটুঙ্গি সব বাজে কথা। আমোও যা তুমোও তা লুঙ্গিও তাই। আমি তুমি আমরা তোমরা রাম শ্যাম জগাই মাধাই সব মিলেমিশে যে সমসত্ত্ব খিচুড়ি তাই হল ব্রহ্মান্ড। এর মধ্যে এতখানি 'আমি' আর এতখানি 'তুমি' দিয়ে গন্ডী কাটা হল জলে লাঠি চালানো।

ঠাকুর মাঝে মাঝেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একথাটা বলেছেন। কথামৃত আমার মুখস্ত নেই, কিন্তু 'ভেদজ্ঞান রাখতে নেই' আর 'নুনের পুতুল সমুদ্রে গিয়ে গলে গেল' এজাতীয় কথা তার মুখ থেকে আকছার বেরোত। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে কেউ যদি বলে 'ভেদজ্ঞান রাখতে নেই', তাহলে প্রথমেই মনে হয় যে বোধহয় ব্যাটা সামাজিক সাম্য প্রচার করতে বসেছে। বামুন চন্ডালের 'ভেদজ্ঞান' নয়, আমার আর আমার পেন্সিলের ভিতর যে 'ভেদজ্ঞান', সেটাকেও ঠাকুর ঘুচিয়ে ফেলতে বলছেন।

মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ
আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সঃ পন্ডিতঃ

এট্টু সমসকৃত ঝাড়ার লোভ সামলাতে পারলামনা এই কারণে যে এই বিশেষ শ্লোকটিকে নিয়ে বঙ্কিমবাবু তার 'গ্রাম্য কথা' প্রবন্ধে নরক গুলজার করেছেন (বিশেষতঃ প্রথম লাইনটা)। সংস্কৃতে লেখা মানেই যে অখন্ড সত্য নয় এটা তার প্রমাণ। পরস্ত্রীকে মায়ের মতে দেখবে, পরের বস্তুকে মাটির ঢ্যালা মনে করবে,

আর এইমাত্র করলেই তুমি 'পন্ডিত' কেহলাবে, এসমস্ত আজেবাজে কথা ছাড়াও এতে রয়েছে মোক্ষম শব্দদুটো - 'আত্মবৎ সর্বভুতেষু'।

কিন্তু ধর্মকথা থাক। মূল প্রশ্নে ফিরে আসি। পদার্থ, আরো ভালভাবে বললে **ভর** (mass)বলে কি সত্যিই কিছু আছে ?

ভর

কোনকিছু যে 'আছে' (অর্থাৎ সাতপাতা প্যাঁচওয়া বিশেষণের পর 'রাজা আসীৎ') তার প্রমাণ কি ?

(১) ইন্দ্রিয়, যদি ইন্দ্রিয়াদি ইত্যাদি প্রমাণকে বৈধ ধরা হয়। যেমন আমার পেন্সিল 'আছে' কারণ এই মুহূর্তে আমার চোখ আর কান দিয়ে আমি তাকে অনুভব করছি।

(২) যদি তার থাকা না থাকায় পারিপার্শ্বিকের উপর কোন প্রভাব দেখা যায়। যেমন পেন্সিলটাকে দাঁড়িপাল্লায় রাখলে খানিক ওজন দেখায়। এবং এই দ্বিতীয় 'প্রমাণ' টা সমস্ত পদার্থের ক্ষেত্রেই সত্যি।

পদার্থবিজ্ঞানের একদম গোড়ার দিকে মনে করা হত, পদার্থের যে ধর্মের জন্য তার একটা 'ওজন' দেখা যায় তাকেই বলে ভর। পরে যখন বোঝা গেল, 'ওজন' ওই বস্তুটার একার নয়, ওর চারপাশে আর সবকিছুর সন্মিলিত প্রয়াস, তখন 'ভর' ব্যাপারটাকে একটু অন্যভাবে অ্যাপ্রোচ করা হল।

কোন বস্তুর 'ভর' (inertial mass) = যার জন্য স্থির বস্তু নড়তে চায়না আর সচল বস্তু থামতে চায়না

যেহেতু এই ধর্মটা সবকিছুর মধ্যেই বিদ্যমান, তাই ভুলভাবে ধরে নেওয়া হল 'ভর' সমস্তকিছুরই একটা মৌলিক ধর্ম। এবং দ্বিপদ বানরজাতির স্বভাবদোষে খুব জলদি জলদি 'ভর' একটা বাজারি পণ্য হয়ে উঠল, এবং 'ভর কি?' তার থেকে বড় প্রশ্ন হয়ে দাড়াল 'কত করে কিলো?' নিউটন কবরের মধ্যে ডন বৈঠক করতে লাগলেন।

কিন্তু 'নাড়াতে চাইলে বাধা দেয়', এর পিছনে কি 'ভর' ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারেনা ?

কোনকিছুকে জানতে হলে সেটাকে বাদ দিয়েই শুরু করতে হয় । তাহলে, 'ভর কি?' জানতে হলে শুরু করতে হবে এমন কিছু জিনিস নিয়ে, যাদের 'ভর নেই' । বর্তমান পদার্থবিদ্যার যেটা standard model তাতে বলছে যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যে সব কণা (ইলেকট্রন, কোয়ার্ক, বোসন) এদের কারোরই শুরুতে 'ভর' ছিলনা । এদের ভর কোথা থেকে এল, তা নিয়ে দুটো মতবাদ বাজারে চলে । তার মধ্যে একটা আমার বোধগম্য, আরেকটা বড় হলে বুঝব । দ্বিতীয়টা দিয়েই শুরু করি ।

একটা চুম্বক আমার বিছানার রাখলে সেটা কতদুর অব্দি আরেকটা চুম্বককে টানতে পারবে ? তত্ত্বগতভাবে, দূরত্বটা অসীম । অর্থাৎ যেকোন চুম্বকের **চৌম্বকক্ষেত্র** ব্রহ্মান্ডের এপার থেকে ওপার অব্দি বিস্তৃত । তেমনি রয়েছে তড়িৎক্ষেত্র, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র (gravitational field), এমনি যাদের শেষ নেই । অর্থাৎ মহাবিশ্বের দূরতম নীহারিকার শেষ নক্ষত্রও পৃথিবীর (এবং আমার) একটা অতিক্ষীণ টান অনুভব করছে । সেটা যে আমার ঘাড়ে এসে পড়ছেনা তার কারণ অবশ্যই যে তাকে নানাদিকে টেনে রাখার আরো অনেক রথী মহারথী চারপাশে রয়েছেন, যার ফলে সেটা কোনদিকেই নড়ছেনা ।

এই ক্ষেত্রফলের প্রশ্নমালায় শেষ অঙ্কটার নাম 'হিগস ক্ষেত্র' (Higgs field) যার ভিতর একবার এসে পড়লে যেকোন কণার একটা নতুন গুণ (বা দোষ) দেখা যায়, অর্থাৎ তার মধ্যে আলস্য বা জাড্য (inertia) চলে আসে । সোজা কথায়, হিগস ক্ষেত্রে ঢুকে পড়ার পরে সেই বস্তু আর সহজে নড়তে চায়না, তাকে 'ঠেলতে' বা 'টানতে' লাগে ।

এখন 'টানা' বা 'ঠেলা' ব্যাপারটা কি ? মাস্টারমশাই ছাত্রকে চড় (অথবা আজকের

পরিস্থিতিতে, ঘুষি) মারলে চড়টা কি 'মাস্টার' এবং 'ছাত্র' এই দুটো গোদা গোদা বস্তুর মধ্যে স্থানান্তরিত হল, নাকি মাস্টারের হাত আর ছাত্রের গালের মধ্যে, নাকি মাস্টারের হাতের পেশীকোষ আর ছাত্রের গালের ত্বকের মধ্যে। নেতি নেতি করতে করতে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল এই যে 'চড়' ব্যাপারটা আসলে মাস্টার আর ছাত্রের ইলেকট্রন প্রোটন গুলো খুব কাছাকাছি এসে যাওয়ায় দুজনের যে যৌথ উপলব্ধি, সেটাই। অর্থাৎ সত্যি বলতে এর হাত ওর গালে কখনো 'স্পর্শ' করেইনি (বস্তুতঃ দুটো পরমাণু কখনও 'স্পর্শ' করা সম্ভব নয়, তার অনেক আগে থেকেই দুজনের প্রোটনের মধ্যে বিকর্ষণ শুরু হয়)।

তাহলে আসলে মাস্টারের থেকে ছাত্রের মধ্যে যেটা স্থানান্তরিত হল সেটা কি? আজ থেকে একশো বছর আগে সত্যেন বোস বলেছিলেন, 'বল' (force) ব্যাপারটাও আসলে একটা 'কণা'-র (particle) এর স্রোত। চড় চাপড় লাথি ঘুষি গুঁতো কনুই চুম্বক তড়িৎ মহাকর্ষ, আসলে সবই এর থেকে ওতে কণার চলাচল। বিদেশী বৈজ্ঞানিক হলে তখুনি কণাগুলোকে নিজের নাম দিয়ে দিতেন। সত্যেন্দ্রনাথ ভারতীয়, তাই বিনয়ের শ্লেষ্মায় আটকে গেলেন। তার মৃত্যুর অনেকদিন পরে পল ডিরাক (কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডাইনামিক্স খ্যাত) এই কণাগুলোর নাম দিলেন 'বোসন'। বোসন নানারকম, যেমন 'ফোটন' যা তড়িচ্চুম্বকীয় বল স্থানান্তর করে। দুটো চুম্বকের মাঝে যে আকর্ষণ তার মূলে এই 'ফোটন' এর আদানপ্রদান। আলো তড়িচ্চুম্বকীয় 'তরঙ্গ', ঠিক মত বলতে গেলে 'ফোটন' এর স্রোত। এক্ষেত্রে মনে রাখা ভালো, রোজকার জীবনে ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি কিন্তু সবই 'তড়িচ্চুম্বকীয়', কারণ পরমাণু মাত্রেই কিছু ঘুরন্ত ইলেকট্রন = চুম্বক। অর্থাৎ ফোটনের একটা অবিরল স্রোত, 'আলোকের এই ঝর্ণাধারার' মধ্যেই ভিজে আছি। একইভাবে, মহাকর্ষের জন্য দায়ী 'গ্র্যাভিট্রন', যদিও তা এখনও আবিষ্কার করা যায়নি। কিন্তু সেটা যে ফোটনের মতই হবে তার নানা প্রমাণ আছে

।

'ফোটন' বা 'গ্র্যাভিট্রন' এর বেগ নির্দিষ্ট, ধরা যাক c। 'বেগ' বলতে বোঝাচ্ছি এই যে হাত থেকে গালে চড়টা পৌঁছতে সময় লাগে, একেবারে 'তৎক্ষণাৎ' হয়না। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো (ফোটন) পৌঁছতে আট মিনিট সময় লাগে। সূর্য নিভে গেলে আট মিনিট পরে পৃথিবীতে লোডশেডিং হবে। যেটা আশ্চর্যের বিষয়, সেটা হল সূর্যের যে মহাকর্ষীয় 'টান', অর্থাৎ 'গ্র্যাভিট্রন', সেটাও পৃথিবীতে আট মিনিটে পোঁছয়। অর্থাৎ সূর্য্য যদি আজ হঠাৎ গায়েব হয়ে যায়, তবে তার আট মিনিট পরেই পৃথিবী কক্ষ্যচ্যুত হয়ে লাট্টুর মত পাক খেতে খেতে মহাকাশে বিলীন হবে, কারণ সূর্য্য ধ্বংস হওয়ার সময় যে শেষ 'গ্র্যাভিট্রন' বেরিয়েছিল, সেটা পৃথিবীতে আট মিনিট পরেই আসবে।)

হিগস ফিল্ড এর জন্য এমনই একটা কণা দায়ী, যার নাম 'হিগস বোসন'। এই কণার সাথে ধাক্কা লাগলেই বাকি সমস্ত কণার 'জাড্য' এসে যায়, অর্থাৎ একরকম করে বলতে গেলে 'ভর' সৃষ্টি হয়, এরকম একটা মতবাদ পদার্থবিদ্যায় চালু আছে। দ্রষ্টব্য এই, যে 'হিগস বোসন' কিন্তু নিজে ভরহীন নয়। হিগস বোসন কেই যদি 'ঈশ্বরকণা' বলে চালানোর চেষ্টা করি, তাহলে 'ঈশ্বর কোথা থেকে এলেন' এজাতীয় একটা অনন্ত নৈয়ায়িক চক্রে ফেঁসে যেতে হয়।

কিন্তু 'ভর' ব্যাখ্যা করতে হিগস বোসনের প্রয়োজন নেই। ক্লাস টেনের অঙ্ক কষেই দেখানো যায়, ভর হল 'ফোটন' এর সীমিত বেগের ফল। ধরি দুটো 'ভরহীন' কণা পাশাপাশি রয়েছে। এই যে দুটো কণার 'সংস্থা' বা 'system', তাকে যদি 'বাহির হইতে প্রযুক্ত কোন বল' F দ্বারা টানা হয়, তবে

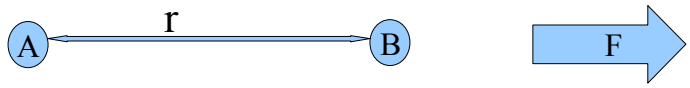

যতক্ষণ F ছিলনা ততক্ষণ A আর B পরস্পরকে মহাকর্ষীয় বল (অথবা তাদের যদি

তড়িতাধান থাকে, তড়িচ্চুম্বকীয় বল) দিয়ে টেনে রেখেছিল। অর্থাৎ তাদের মধ্যে ফোটন আর গ্র্যাভিট্রনের আদানপ্রদান চলছিল। তারা r দূরত্বে থাকলে তাদের ভিতরকার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বল সমান হয়, একারণেই এই দূরত্বে তারা চুপচাপ ছিল। এখন যেই ডানদিক থেকে টান এল, সেটার যেহেতু বেগ সীমিত, তাই সেটা B কে আগে টানবে, তার খানিকক্ষণ পরে A -র কাছে পৌঁছবে। ততক্ষণে কিন্তু B খানিকটা ডানদিকে এগিয়ে গেছে, এবং দুজনের মধ্যেকার দূরত্ব বেড়ে যাওয়াতে আকর্ষণ বলটা বিকর্ষণের চেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে। এই আকর্ষণ বল যেহেতু বাইরের টান F এর বিপরীতমুখী, এটা F কে বাধা দেবে, যতক্ষণ না A নড়াচড়া শুরু করে খানিকটা ডানদিকে এসে সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনবে। এই 'বাধা' টাই স্থূলদৃষ্টিতে 'জাড্য' হয়ে দেখা দেয়।

আমরা মনে করতাম একটা কিছুকে ঠেলা দিলে তার পুরোটাই একসাথে নড়ে। কিন্তু আমাদের 'ঠেলা' টার যেহেতু একটা নির্দিষ্ট বেগ c রয়েছে, তাই সেটা বস্তুর সমস্ত জায়গায় একসঙ্গে পৌঁছয়না। আর এই দেরিটার কারণে বস্তুর বিভিন্ন কণার মধ্যে গতিও একসাথে আসেনা। একটা মালগাড়ির ইঞ্জিন চলতে শুর করলেই যে পুরো গাড়িটা চলতে আরম্ভ করে তা নয়। যতক্ষণ না প্রতি বগির ভিতর চেন (link) টান টান হচ্ছে, ততক্ষণ সেই বগি নড়েনা।

বস্তুর জাড্য হল ফোটনের সীমিত বেগের একটি ফলাফল

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো মোটা মোটা, মাথাটা আরো মোটা। আমরা 'জাড্য' কেই ভর বলে চালাই। আসলে 'ভর' বলে কিছু নেই। যে জিনিসটাকে ঠেলতে যত জোর লাগে, অর্থাৎ যার যত বেশি জাড্য, সেটা ততই 'ভারী'। সোজা কথায় বলতে গেলে, **ফোটনের (অর্থাৎ আলোর) সীমিত বেগ আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে 'ভর' হয়ে দেখা দেয়।**

'পান্না', 'সবুজ' আর 'আমি'

তাহলে 'পান্না' যেটা, সেটাই 'সবুজ'। ভর আর শক্তি দুটোরই উৎস হল ফোটন। বাকি রইল 'আমি'।

মহাবিশ্বে কোন ব্যাপারটা কি সেটা চট করে পড়ে ফেলা যায়না। পরমাণুর মধ্যে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরন্ত ইলেকট্রন, আর সূর্যের চারিদিকে ঘুরন্ত গ্রহের সাদৃশ্য অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। *হয়তো আমাদের এই গোটা ব্রহ্মান্ডটাই অন্য কোন 'বড়' ব্রহ্মান্ডের একটা পরমাণু* । আমাদের মত অযুতে নিযুতে ব্রহ্মান্ড-পরমাণু জুড়ে আরেকটা ব্রহ্মান্ড তৈরি। হয়তো সেই ব্রহ্মান্ডে 'আমি' একটা ইলেকট্রনের বেশি কিছু নই।

আবার আমরা যাকে 'পরমাণু' বলি, সেটা নিজেই একটা 'ছোট' ব্রহ্মান্ড হতেও বাধা নেই। তার ভিতরেও হয়তো এখন কিছু 'বুদ্ধিমান' প্রাণি খাতা কলম নিয়ে তার সৃষ্টিরহস্য ভাবতে বসেছে। হয়তো যাকে আমি 'ফোটন' বলছি, যে এমনই একটা প্রাণী।

'আমি' - র পরিব্যাপ্তি এতটাই। উপরে বা নিচে কোথাও শেষ নেই। একটা ছবিকে 'জুম' করতে করতে একসময় শেষ হয়, তার বেশি আর কাছে যাওয়ার উপায় নেই। কিন্তু মহাবিশ্বের 'জুম' দুদিকেই অনন্ত। যেদিকেই তাকাই 'আমি'-র মস্ত বড় মইটা অলকানন্দার শেষ সিঁড়ি থেকে নামতে নামতে রসাতলের ভোগবতী অব্দি গিয়ে মিশেছে।

নাকি নয়?

কি আছে শেষে?

শ্যামনগর, ২০১৪